সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে

বর্তমানে ভারতবর্ষের যুবসম্প্রদায় যে সব সমস্যার দ্বারা পীড়িত তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। ১৯৭০ সালের জুন মাসে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইউথ অরগানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সমস্যাগুলির উৎস সন্ধানে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন এবং যুবজীবনের সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশিকা তুলে ধরেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি দেখান, যুবকদের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ উচ্ছেদের প্রশ্নটির সাথে কীভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমানে মেকি বামপন্থীরা যখন প্রকাশ্যেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটের ভূমিকা পালন করছে, সেই সময় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে এই হুঁশিয়ারিটি যুব জীবনের নৈরাশ্য, অবক্ষয় ও অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

বন্ধুগণ,

অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইউথ অরগানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'আমাদের দেশের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং যুবসমাজের কর্তব্য' এই বিষয়ের উপর আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটা আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই, তা হ'ল, রাজনীতির প্রশ্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী — এটা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাটা কী ধরনের এবং রাষ্ট্রের চরিত্রই বা কী। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্বের বিশ্বজোড়া সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বা 'মনার্কিক্যাল' রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাজতন্ত্রের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে বর্তমান দুনিয়ায় আমরা যে কয় ধরনের রাষ্ট্র দেখছি সেগুলিকে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করতে পারি ঃ (১) পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, (২) ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, (৩) জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং (৪) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে 'পিপলস্ ডেমোক্রেটিক স্টেট' (জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র) সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে। এখন, কোন্ রাষ্ট্রের চরিত্র কী ধরনের তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোন্ শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন — অর্থাৎ রাষ্ট্রটি প্রধানত কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। এরই সাথে আমাদের বুঝতে হবে সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটি, অর্থাৎ ধাঁচাটি কী ধরনের এবং তার প্রকৃতিই বা কী। সমাজবিকাশ ও সমাজ অগ্রগতির এক একটি বিশেষ স্তরে এক একটি অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং তারই উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনপ্রণালী গড়ে ওঠে। এখন বিচার্য বিষয় হ'ল আমাদের দেশে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা আজকের দিনে সমাজের বিকাশ ও ক্রমোন্নতির সহায়ক কি না, পরিপূরক কি না;নাকি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও অগ্রগতির পথে আজ এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন, এ প্রশ্নগুলি বিচারের ক্ষেত্রে একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মূলগতভাবে দুটো পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে বাধ্য। বিচারের পূর্বে এর যে কোন একটিকে আপনাদের অনুসরণ করতে হবে। যে কথাগুলো আমি বলব সেকথাগুলো সম্পর্কেও মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, যে কোন বিষয়কে বুঝতে হলে বা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের সমাজে যে মৌলিক

বিপরীতধর্মী দু'টি দৃষ্টিকোণ রয়েছে তার কোন না কোন একটির দ্বারা আপনাদের বিচার ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য — তা সে জেনেই হোক্ বা না জেনেই হোক্। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা বিচারের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করবেন তা আপনাদের উপরই ন্যস্ত থাকবে। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা আমি বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি সেটা আমি বলব।

আমাদের সমাজ — আমরা চাই বা না চাই — শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত সমাজ। এটা একটা সাদামাটা কথা। এর একদিকে কোটি কোটি শোষিত জনসাধারণ যারা শ্রমের বিনিময়ে কোনমতে তাদের দিন গুজরান করছে; অপরদিকে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী যারা দেশের ধনসম্পদ যতটুকু রয়েছে তার মালিক এবং তার কর্তৃত্ব করছে — মানুষের পরিশ্রম দিয়ে দেশে ধনসম্পদ যতটা বাড়ছে মুনাফার মাধ্যমে তাকে তারা আত্মসাৎ করছে। তার ফলে দেশে শিল্পোন্নতি যতটুকু হচ্ছে, শিল্পবিকাশ যতটুকু হচ্ছে, যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। সাধারণ মানুষের জীবনে তার ফল বর্তাচ্ছে না। দারিদ্র্য চরম আকার নিচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটছে, নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই যে সমাজ মূলত শোষক ও শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত, এটা কেউ চেয়েছে বলে হয়নি। আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সমাজ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একে অস্বীকার করার আমাদের উপায় নেই। আর যখন থেকে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে তারপর থেকেই মানুষ হিসাবে, স্বেচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্, জেনেই হোক্ বা না জেনেই হোক্, আমরা কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, জড়িয়েই বাস করি। কারণ উৎপাদনের সঙ্গে কোন না কোন প্রকারে সম্পর্ক স্থাপনা ব্যতিরেকে আমরা সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে বসবাস করতে পারি না। খাওয়া, পরা, জীবনধারণ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপনা করতে হয়; এবং এই সম্পর্ক স্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। এখন এই যে সমাজে পরস্পরবিরোধী দুটো শ্রেণী রয়েছে তাদের পরস্পরবিরোধী দুটো স্বার্থবোধও রয়েছে। শোষকশ্রেণী প্রচলিত সমাজব্যবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় বলে সবসময়ই সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম, অনুশাসন, যুক্তি, আদর্শবাদ, ন্যায়নীতি, আইনকানুন, অর্থনীতিশাস্ত্র — সমস্ত কিছুকে তারা গড়ে তোলে, তার সপক্ষে তারা প্রচার করে, যুক্তিজাল বিস্তার করে। অবশ্যই এগুলি তারা সমস্ত মানুষের স্বার্থের নামেই করে, 'সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য করছি' বলেই করে। কিন্তু আসলে এ সমস্তই তারা তাদের শ্রেণীশাসন এবং শোষণটিকে বজায় রাখার জন্যই করে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখাই শোষকশ্রেণীর স্বার্থ। আর এর থেকেই তার শ্রেণীস্বার্থবোধের জন্ম। ঠিক তেমনই একটা শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় যারা শোষিত হচ্ছে সেই মানুষগুলো, অর্থাৎ শোষিতশ্রেণীগুলো, শোষণমুক্তির জন্যই শোষণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাটাকে পাল্টাতে চায় যাতে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ যারা শোষণে জর্জরিত হচ্ছে তারা শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে, অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশসাধন করতে পারে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই দেখা যায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইতিহাসের সমস্ত স্তরে শোষণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলে বেশিরভাগ মানুষের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম — এরূপ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা সবসময়েই শোষিতশ্রেণীগুলি গড়ে তুলতে চেয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে শোষণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলাই শোষিত মানুষের স্বার্থ। আর এর থেকেই তার শ্রেণীস্বার্থবোধের জন্ম।

তাই শোষক ও শোষিতে ভাগ হওয়ার পর থেকেই একটা দ্বন্দ্ব নিয়ত সমাজের অভ্যন্তরে শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে চলছে। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে সর্বক্ষেত্রে এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব নিয়তই চলছে। এই দ্বন্দ্ব চলতে চলতে সংগ্রাম যখন একটা চরম রূপ নেয় তখন তা সরাসরি 'কন্‌ফ্লিক্ট' (সংঘর্ষ) বা বিপ্লবে পর্যবসিত হয় এবং শেষপর্যন্ত পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্‌টে যায় এবং তার পরিবর্তে আর একটা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থার স্থাপনা হয়।

শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর সমাজ যে বারে বারে পাল্‌টেছে, সমাজ পাল্‌টাবার সেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৌলিক নিয়মটি হচ্ছে — সমাজ অভ্যন্তরে শোষক এবং শোষিতের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব চলতে চলতে যখন

একটা চরম পরিণতিতে পৌঁছায়, যখন আর কোনমতেই একই সমাজের অভ্যন্তরে শোষক এবং শোষিত আপস করেও চলতে পারে না, জীবনযাপন করতে পারে না — তখন একটা চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় আসে এবং এই চূড়ান্ত মোকাবিলার মধ্য দিয়ে শোষিতশ্রেণী শোষকশ্রেণীকে উৎখাত করে দিয়ে একটা নতুন সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নতুন নিয়ম, আইন-কানুন, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এই সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি — যা কিছু আমরা দেখছি — এসবই একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তার উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সমস্ত কিছুকেই দেখভাল করবার ও রক্ষা করবার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীর হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যার দ্বারা শাসকশ্রেণী তাদের সমস্ত 'ইন্‌স্টিটিউশন্‌স' (প্রতিষ্ঠানগুলি), সমস্ত কার্যকলাপ, অর্থনীতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের যত আন্দোলন এবং কর্মপ্রচেষ্টা — সমস্ত কিছুকে রক্ষা করে। তাই রাষ্ট্র হচ্ছে, এক কথায়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোন না কোন শ্রেণীর হাতে শ্রেণীশাসনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। ইতিহাসের ছাত্র হলে একথা অস্বীকার করার উপায় কারো নেই। কেবলমাত্র অনৈতিহাসিক মনগড়া কথার দ্বারা গায়ের জোরেই একথা অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ইতিহাস, রাষ্ট্রবিপ্লবের ও রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, সমাজ গড়ে ওঠা ও সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস যদি আমরা অনুসন্ধান করি এবং জানতে পারি তাহলে যে কথাগুলি আমি বললাম তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

তাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বর্তমানে কী সেটা যথার্থভাবে নিরূপণ করতে হলে এই শোষক এবং শোষিতের মধ্যে কার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা সমস্যাগুলোকে বিচার করব — প্রথমে সেইটাই ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা যখন বলব দেশের বর্তমান পরিস্থিতি — তখন এই 'দেশ' কথাটাকে আমরা কাদের অর্থে ভাবব? দেশের পঞ্চান্ন কোটি মানুষের মধ্যে যারা তিপ্পান্ন কোটি মানুষ, যারা খেটে খায়, যারা অক্লান্ত শ্রমের দ্বারা দেশের সম্পদ তৈরি করছে, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে গ্রামের অজ্ঞ চাষী এবং খেতমজুর পর্যন্ত তাদের নিয়ে ভাবব — তাদের নিয়েই তো দেশ, তাদের স্বার্থ, তাদের কল্যাণের কথা, তাদের ভবিষ্যতের কথা এই অর্থে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবব এবং দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করব? নাকি এই পঞ্চান্ন কোটি মানুষের মধ্যে যারা নিতান্তই মুষ্টিমেয় দু'এক কোটি লোক, যারা দেশের যা সম্পদ রয়েছে তার মালিক হয়ে বসেছে এবং যারা শোষণের রাস্তায় দেশের শ্রমশক্তিকে এবং মানুষের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটছে সেই অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাদের স্বার্থে আমরা দেশের কথা ভাবব? শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মালিক-মজুর, শোষক-শোষিত — উভয়ের স্বার্থ বলতে, উভয়ের দেশ বলতে এক এবং অভিন্ন স্বার্থবোধ নেই। হয় মালিকের স্বার্থে দেশাত্মবোধ, না হয় শোষিত জনসাধারণের স্বার্থে দেশাত্মবোধ। 'জাতীয় উন্নতি', 'জাতীয় অগ্রগতির সমস্যা' — এই সমস্ত কথা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে এবং শ্রেণীস্বার্থের কথা উল্লেখ না করে, গোল গোল করে, ভাসাভাসাভাবে যারা বলে তারা হয় ধাপ্পাবাজ, নাহয় আকাট মূর্খ;হয় হাড় শয়তান, নাহয় রাম মূর্খ। এ দুটোর যে কোন একটা তারা বেছে নিতে পারে, কোন আপত্তি নেই। 'সকলের স্বার্থ'— এরকম কোন জাতীয় স্বার্থবোধের কথা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে একমাত্র শয়তানেরাই বলতে পারে, নাহয় অজ্ঞতার জন্য আকাট মূর্খের দল বলতে পারে। যারা সত্য কথা বলতে চায়, যারা ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে, যারা জনসাধারণের কথা বলবে, যারা শ্রমিক-চাষী-খেতমজুর ও অন্যান্য শোষিত মানুষের কথা বলবে তারা এরকম ভাসাভাসাভাবে বলতে পারে না। তাদের বলতে হবে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে, কার অর্থে দেশের স্বার্থবোধ?

এখন এই যে সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে, তার সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা কীসের জন্য? সেটা এইজন্যই যে সমস্যাগুলি বুঝে যাতে সেই সমস্যাগুলির সমাধান আমরা করতে পারি, যাতে দেশের কল্যাণ হয়। এই দেশের কল্যাণের ভাবনাটা মালিকশ্রেণীর যেরূপ, শোষিতের তেমন নয়। আর সর্বহারাশ্রেণী ও শোষিত জনসাধারণের স্বার্থে যদি সমস্যা বিচার করতে হয় এবং তার সমাধান করতে হয় তাহলে প্রথমেই আমাদের যে কথাটির সম্মুখীন হতে হবে, তা হ'ল, মিথ্যা দিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে শোষিতশ্রেণীর কাজ চলবে না। তাদের সত্যানুসন্ধান করতে হবে। আর সত্যানুসন্ধান করতে না পারলে তারা সমাজের আসল সমস্যা কী তাও জানতে পারবে না। শুধু মনগড়া কতকগুলো কথা বা অপরের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে করে দিনগত পাপক্ষয় করবে — সমস্যার চরিত্র বুঝতে পারবে না, তার জট ছাড়াতে পারবে না, সত্যিকারের সমাধানের পথও দেখতে পাবে না। তাই যারা শোষিত মানুষ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ চর্চা যুগে যুগে প্রধানত

তারাই করেছে। শোষকরা শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, তাকে খানিকটা আধুনিকীকরণের জন্য, তাদের যুদ্ধোপকরণ এবং রাষ্ট্রের নিপীড়ন যন্ত্রগুলিকে আরও শক্তিশালী এবং উপযুক্ত করার জন্য, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য এবং আমিরির জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছে ঠিকই; কিন্তু বাস্তবে জ্ঞানজগতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করেছে সর্বযুগে শোষিত সম্প্রদায় তাদের বাঁচার তাগিদেই। কারণ যুগে যুগে শোষিতশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের ক্রমবিকাশ ও সমাজবিপ্লবের প্রশ্নটির সাথে জড়িয়ে থাকে বলেই সত্য জানবার সত্যিকারের প্রয়োজন শোষিতশ্রেণীর। আর শোষকশ্রেণীর সত্যকে চাপা দেওয়াই কাজ। সত্য যদি জনসাধারণ ধরে ফেলতে পারে, কেন তাদের এত সমস্যা তার সত্য উত্তরটি যদি জনসাধারণ খুঁজে পায়; কেন যুবকদের এত সমস্যা, কেন তারা বেকার তার সত্য উত্তরটি যদি যুবকেরা জানতে পারে তাহলে একদিন তারা বারুদের মতো ফেটে পড়তে পারে। শোষক সম্প্রদায়ের কোন প্রলোভন, কোন বক্তৃতাবাজি, কোন রাজনৈতিক চালাকি তাদের আটকে রাখতে পারবে না। তাই যত মিথ্যা কথার বেসাতি, যত চালাকি, যত অসত্য ভাষণ এবং সত্যকে চাপা দেবার প্রচেষ্টা শোষকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দালালেরা নিয়ত চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শোষিতশ্রেণী মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় সবসময়ে সবযুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সত্যকে 'ডিটেল্‌স্‌-এ, কংক্রিটলি' (খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশদভাবে) জানবার চেষ্টা করেছে। তাই আমরা যদি শোষিতশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে, জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রমিক-চাষী শোষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থে দেশের পরিস্থিতি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হবে। তাহলে কোন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থাকে বুঝতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কী — অর্থাৎ কোন্‌ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, এবং কোন্‌ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে আমাদের বুঝতে হবে সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটা — অর্থাৎ তার ধাঁচাটা কী ধরনের এবং তার প্রকৃতিই বা কী।

'রাষ্ট্রের কোন শ্রেণীচরিত্র নেই', 'রাষ্ট্র সকল লোকের', 'রাষ্ট্র শ্রেণীর ঊর্ধ্বে', অর্থাৎ 'সুপ্রা ক্লাস' — এ যারা বলে তারা মহা ধাপ্পাবাজ। তারা রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসকেই মানুষের সামনে চাপা দিতে চায়। রাষ্ট্র আকাশ থেকেও পড়েনি বা স্বয়ং ভগবান এসেও রাষ্ট্র গড়ে দিয়ে যাননি। মানুষের সভ্যতার বিকাশের, অর্থাৎ সমাজবিকাশের ধারায় উৎপাদনের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে এসেই রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের বা রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন যে, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের গোষ্ঠীসম্পত্তির উপর গায়ের জোরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তাকে রক্ষা করার স্বার্থে মালিকশ্রেণীকে যে শাসনের ও শোষণের শক্তি গড়ে তুলতে হয়েছিল তাই কালক্রমে বিকাশ লাভ করতে করতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে মুছে ফেলবার ক্ষমতা কারো নেই।

তাহলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কী— তা যদি না বুঝতে পারি, এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র কী এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কী — এগুলি যদি না আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি তাহলে বর্তমানকালের শোষণের প্রকৃতি কী তা আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারব না এবং বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন — এ সবের সঠিক কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হব না। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ যুবকদের কাজ পাওয়ার সমস্যা, অর্থাৎ বেকারির সমস্যা আসলে কোথায় কীসের সাথে জড়িয়ে আছে, কোন্‌ প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাও আমরা ধরতে পারব না এবং কোন সমস্যা সমাধানেরই পথনির্দেশ করতে পারব না। ফলে আমরা শুধু স্লোগান তুলব, শুধু আন্দোলন করব বলে সংগঠিত হব, কখনও কখনও জোরদার আন্দোলনও হয়তো করব, কিন্তু আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই আমাদের ঠিক থাকবে না। কোথায় আঘাত করতে হবে, কে শত্রু, কে মিত্র, কোন্‌ জায়গাটায় আঘাত করলে, ঘা দিলে এবং কোন্‌ রাস্তায় ও কীভাবে আন্দোলন করলে শেষপর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান হবে সেইটাই যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে শুধু 'আঘাত কর', 'আঘাত কর' বলে চিৎকার করে বা এখানে-সেখানে আঘাত করেও কোন লাভ হয় না। বরঞ্চ এর ফলে মানুষের আঘাত করার যে শক্তি রয়েছে তাকে সংগঠিত না করে শুধু বিপথগামী করা হয় এবং যেখানে আঘাত করে কোন লাভ নেই তেমন জায়গায় আঘাত করে একদিকে শক্তির অপচয় হয়, আঘাত করার শক্তিটাই সাময়িকভাবে হলেও নষ্ট হয় এবং কাজও কিছু হয় না। অপরদিকে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যারা লড়াই করল তাদের মধ্যে দেখা দেয় চূড়ান্ত হতাশা।

এই হতাশাগ্রস্ত হয়ে গিয়ে তারা ভাবতে থাকে, 'অনেক লড়াই হ'ল, অনেক পরিশ্রম করা হ'ল, অনেক জেল খাটা হ'ল, অনেক আত্মত্যাগ হ'ল, কোরবানি হ'ল, কিন্তু শেষপর্যন্ত হ'ল কী? যুব সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে, বেকার সমস্যা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে — তার কেশাগ্রও তো আমরা স্পর্শ করতে পারলাম না, বরঞ্চ দিনের পর দিন তা বেড়েই চলেছে। ফলে লড়াই-টড়াই করে কিছু হবে না। সব পার্টিকেই দেখলাম।' জনমনে এইরূপ হতাশা এবং প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে শাসক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিই তাদের শাসনের যন্ত্রটাকে আরও পাকাপোক্ত করে তোলার সুযোগ পায়, আর দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন কিছুদিনের জন্য হলেও মার খায়। তাই দেখা যাচ্ছে আদর্শ, নীতি এবং রাজনৈতিক লাইন ঠিক না হলে 'বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে', 'যুবকদের নৈতিক মান গড়ে তুলতে হবে', 'যুবকদের আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হবে', 'জাতিকে গড়তে হলে যুবকরাই পারে' — এইসব ভাল ভাল অথচ কোন মানে হয় না এমন সব কথা বলে কিছুদিন কিছু যুবককে আমরা খেপাতে পারি, দলবদ্ধ করতে পারি, কিছুদিন একটা সংগঠনের মধ্যে আটকে ফেলার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু শেষপর্যন্ত যুবসমস্যাগুলির আমরা কোন সমাধানই করতে পারি না। যুব সমস্যা তথা বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক অধঃপতন প্রভৃতি সমস্যাগুলোর সমাধানের সঠিক রাস্তা পেতে হলে যে দু'টি মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে বা তার গুরুত্ব লাঘব করে দেখলে চলবে না তার একটি হ'ল, ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কী — অর্থাৎ কোন্ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন? আর দ্বিতীয়টি হ'ল, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র কী এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কী? এই দু'টি প্রশ্নের ঠিক ঠিক সমাধান করতে পারলেই আমরা সর্বপ্রকার শোধনবাদ ও বুর্জোয়া সংস্কারবাদী চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক বিপ্লবী লাইনের সন্ধান পেতে পারি।

এখন দেখা যাক্, আমাদের দেশে যে রাষ্ট্রটি কায়েম রয়েছে তার ধরন-ধারণ ও চরিত্রটি কী? তাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় কোন্ ধরনের রাষ্ট্র বলা চলে? ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমরা জানি রাষ্ট্র হচ্ছে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা 'সুপার-স্ট্রাকচার' বা উপরিকাঠামো এবং রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীর হাতে শ্রেণীশাসন ও শ্রেণী-আধিপত্য বিস্তারের সবচেয়ে শক্তিশালী, সশস্ত্র হাতিয়ার। কিন্তু এখানে যে কথাটি সাথে সাথে মনে রাখতে হবে, তা হ'ল এই যে, শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের 'টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট'-এর (আঁকাবাঁকা পথের) জন্য এবং পুঁজিবাদের অসম বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন এইটাই প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কথাটি না বুঝলে 'ইকনমিক ডিটারমিনিজ্‌ম্' (অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ) বা নানা ধরনের শোধনবাদী চিন্তার খপ্পরে পড়বার সর্বদাই আশঙ্কা থাকে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী যে প্রায়শই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে — এই ঐতিহাসিক সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চুলচেরা বিচার না করেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন।

এখন আমাদের দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কী ধরনের খানিকটা তা আলোচনা করে দেখা যাক। সাদামাটা কথায় সকলেই বোঝে এটা একটা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? এই ধরনের একটা বক্তৃতায় পুঁজিবাদ সম্বন্ধে ও তার সমস্ত জটিল নিয়মকানুন এবং প্রক্রিয়াগুলিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু যে কথাগুলিকে না বুঝলে পুঁজিবাদের মূল চরিত্রকে, তার মূল নিয়মগুলিকে আপনারা বুঝতে পারবেন না, এখানে আমি কেবলমাত্র সেগুলিরই উল্লেখ করব। সাধারণভাবে আপনারা নিজেরাই জানেন যে পুঁজিবাদ বলতে মোটা কথায় এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে মালিক-মজুর রয়েছে, সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হচ্ছে। অর্থাৎ উৎপাদন যেখানেই হচ্ছে সেখানেই উৎপাদন-সম্পর্কের প্রধান রূপটি হচ্ছে মালিক আর মজুরের সম্পর্ক — একজন মালিক, আর একজন মজুর বা 'ওয়েজ আর্নার'। মজুর তার শ্রম বিক্রি করে মজুরি পায়। আর মালিক তাকে যে মজুরি দেয় সেটা ন্যায্য কি না তা নির্ণয় করার সামাজিক ন্যায়নীতি অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিও এখানে নেই। সেটা প্রধানত মালিকের ইচ্ছা এবং অনেকটা খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে। ন্যায্য মজুরি নির্ণয়ের মাপকাঠি কেবলমাত্র তখনই নির্ধারিত হতে পারে যখন উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মজুরের শ্রমের ফলে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যে লাভ হচ্ছে, সমাজে যে মোট সম্পদের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটি অংশ দেশের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়নে নিয়োগ করে বাকি সমস্ত মজুরের প্রাপ্য হিসাবে ফিরে আসবে।

এরূপ অবস্থাতেই, অর্থাৎ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই, কেবলমাত্র বলা চলে যে সামাজিক ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মজুরের ন্যায্য মজুরি দেওয়া হ'ল। এরকম একটি ব্যবস্থা যতদিন প্রবর্তিত না হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানা — অর্থাৎ মালিকি ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা — যতদিন চালু থাকছে ততদিন মজুরের মজুরি থেকে মালিক একটা মোটা ভাগ বসাবেই। দেশের সমস্ত সম্পদই সৃষ্টি হচ্ছে মজুরের পরিশ্রমের ফলে। অথচ মালিকশ্রেণী বিনা পরিশ্রমেই তাতে একটা মোটা ভাগ বসায় এবং তাতে ফেঁপে ওঠে; তার পুঁজির পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে। আর মজুরের দারিদ্র্য জীবনেও ঘোচে না;এমনকী তার চাকরির স্থায়িত্বও থাকে না। এরকম যে ব্যবস্থা তাকে আমরা সাদামাটা ভাষায় পুঁজিবাদ বলি। এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও শিল্পের 'ন্যাশনালাইজেশন' (জাতীয়করণ) প্রভৃতি কার্যক্রম বুর্জোয়াশ্রেণী গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার ফলে মালিক-মজুর সম্পর্কের অবসান তো হয়ই না, বরং তা আরও চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মটিও এর দ্বারা অবলুপ্ত হয় না। বরং জাতীয় সম্পত্তির দোহাই পেড়ে এক্ষেত্রে শোষণ আরও নির্মম আকার ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যেখানেই মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হয় এবং যে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন তাকেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলা হয়।

একদিকে মজুরের ন্যায্য মজুরি দেওয়া এবং উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মজুরের আয় ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া এবং অপরদিকে সমাজবিকাশের সামগ্রিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের যা যা প্রয়োজন, অর্থাৎ সমাজের যে সামগ্রিক প্রয়োজন, তার হিসাব করে পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন করা এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জিনিসপত্রের মূল্য ধার্য করে সুষম বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা — এইসব সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়েই কী আমাদের দেশে উৎপাদন হয়? হয় না। যেটা হয় তা হ'ল মজুরকে একটা ন্যূনতম মজুরি দিয়ে — অর্থাৎ যেটুকু না হলে মজুর বেঁচে থেকে মালিকের মুনাফা লোটার যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে না সেটুকু দিয়ে — দেশের উৎপাদিত সম্পদের বাকি সমস্ত অংশ চলে যায় ব্যক্তিগত মালিকের লাভ হিসাবে তার পকেটে এবং আমলা পোষণ করতে। ফলে না বাড়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, না হয় বাজার সম্প্রসারণ, না হয় দেশের ক্রমাগত শিল্পবিকাশ। কারণ এখানে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। সোজা কথায়, লাভ না হলে পুঁজিপতিরা এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করে না। ফলে কলকারখানা গড়ে ওঠে না। উৎপাদনও হয় না। এরকম ব্যবস্থাকে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলি যে ব্যবস্থার মূল কথা হ'ল পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন এবং সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন — সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার কথাটা শুধু কথার কথামাত্র। এখানে সমাজের ক্রমোন্নতি এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদনের নীতি নির্ধারিত হয় না, উৎপাদনের নীতি নির্ধারিত হয় লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আমাদের দেশে এইরকম ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শোষণ হচ্ছে, মজুরের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকিদিয়ে তার থেকে একটা বিরাট অংশ আত্মসাৎ করে মুনাফা হিসাবে রাঘব বোয়ালদের, অর্থাৎ মালিকদের পকেটে চলে যাচ্ছে। আর বাজার যদি তেজি থাকে, অর্থাৎ পণ্য বিক্রির যদি বাজার থাকে তাহলে মুনাফার ছিঁটেফোঁটা অংশকে অধিকতর লাভের আশাতেই মালিকরা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করছে, কিন্তু তার বেশিরভাগটাই মুনাফারূপে এবং নানান খাতে চলে যাচ্ছে মালিকদের পকেটে। এরূপ অবস্থায় দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে বাধ্য, দেশের মজুরদের সত্যিকারের আয় কমে যেতে বাধ্য। আর যদি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে থাকে তাহলে ক্রমাগত শিল্পোদ্যোগের পথে পা বাড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ হয় না এবং গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য ও দুর্দশাও কোনমতেই ঘুচতে পারে না। তাহলে এইরূপ অবস্থায় মানুষ কাজ পাবে কোথায়? কে তাদের কাজ দেবে? বসিয়ে বসিয়ে কেউ মাইনে দিতে পারে না — ব্যক্তিগত মালিকও দিতে পারে না, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও দিতে পারে না।

আমাদের ব্যবস্থাটি শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেবল তাই নয়। এ এমন পুঁজিবাদ যে এখানে উৎপাদনের অবাধ বিকাশের আর কোন সম্ভাবনা নেই। এ পুঁজিবাদ পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদ হলেও সঙ্কট জর্জরিত পুঁজিবাদ। যদিও এরই মধ্যে কিছু কিছু শিল্পবিকাশ হচ্ছে না, বা কিছু কিছু বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে না — এমন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বাজার সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, পাঁচটা কারখানা গড়ে উঠছে তো দশটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নতুন লাইসেন্স বা পারমিট নিয়ে হয়তো একজন একটা উদ্যোগ বা কারখানা খুলল, হয়তো রাষ্ট্র নিজেই কোন কোন ক্ষেত্রে খানিকটা উদ্যোগ নিল — কিন্তু যে কারখানাগুলি চালু ছিল সেগুলো হয় কাঁচামালের অভাবে, না হয় বাজারের অভাবে যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে সেই উৎপাদিকা শক্তিরও পূর্ণ

ব্যবহার বন্ধ করে দিল, শিফট বন্ধ করে দিল, উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ'ল, মজুর ছাঁটাই করে দিল, 'লে-অফ' হয়ে গেল। কারণ কাজ নেই। লে-অফ হয় কেন? যখন বাজার থাকে, ক্রমাগত পণ্য উৎপাদনের চাহিদা থাকে তখন কারখানায় কখনও লে-অফ হতে পারে না। সে দেশেই কারখানায় লে-অফ হয় যেখানে উৎপাদিকা শক্তি অলস হয়ে পড়েছে, বা পড়ছে। তা নাহলে তো লে-অফের কোন কথাই ওঠে না। মজুর কাজ করতে চাইছে কিন্তু তার পরিশ্রমের শক্তিকে এরা কাজে লাগাতে পারছে না। উৎপাদিকা শক্তির পুরো ব্যবহার করতে গেলেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদন বাড়তি হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন গুদামে জমে যাচ্ছে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে পণ্য বিক্রির বাজার নেই এবং প্রবল প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য কারণের জন্য বিদেশের বাজারেও সুবিধা হচ্ছে না। আজকের পুঁজিবাদ অতীতের ন্যায় ক্রমাগত বাজার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে শিল্পবিপ্লবের রাস্তায় অগ্রসর হওয়ার মতো পুঁজিবাদ নয়। আজকের সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্কটের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বপুঁজিবাদী তীব্র বাজার সঙ্কটের যুগে কোন দেশের পুঁজিবাদই অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের মত ধারাবাহিকভাবে একটানা বাজার সম্প্রসারণ ঘটাতে পারছে না। আমাদের দেশের এ পুঁজিবাদ হ'ল ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষের মতো একটি পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদের পক্ষে তো এটা আরও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কৃষিতে ব্যাপক যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ সম্ভব হচ্ছে না এবং সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবসান হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাসগুলি এখনও টিকে রয়েছে। 'ফিউডালিজম বা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ রয়েছে' — এরকম গোল গোল করে বললে চলবে না। আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পর্ক আছে কি? আমার যতটুকু জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি আছে তাতে বলতে পারি আমাদের দেশে ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পর্ক কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদন-সম্পর্ক তার জায়গা দখল করেছে, দেশ-কালের প্রভেদের জন্য রূপ তার যাই হোক না কেন। কিন্তু যেহেতু এখানে কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘটেনি, যেহেতু আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়নি, কৃষির যন্ত্রীকরণ হয়নি সেইহেতু আমাদের দেশের ভূমিসম্পর্ক পুঁজিবাদী নয়, সামন্ততান্ত্রিক — এরকম করে যেসব পণ্ডিতরা বিচার করছেন তারা আর যাই হোক্ অন্তত বর্তমান যুগে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে পুঁজিবাদের চরিত্রকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। এ যুগের পুঁজিবাদ তীব্র বাজার সঙ্কটের জন্য, ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রের জন্য এবং সর্বোপরি উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিক্রিয়াশীল রূপের জন্য যেহেতু ধারাবাহিকভাবে শিল্পবিকাশের রাস্তায় পা বাড়াতে পারছে না সেইহেতু পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে আজকের পুঁজিবাদ কৃষি-অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ করতে পারছে না। কলকারখানা ও শিল্প গড়ে ওঠার রাস্তা যদি ক্রমাগত খুলে দিতে না পারা যায় তাহলে ট্র্যাক্টর-মেশিন নিয়ে কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে গেলে এক ধাক্কায় গ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে, বেকারের চাপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। এমনিতেই যেখানে ক্রমাগত বেকারের সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করছে সেখানে পুঁজিবাদ তার নিজের বেঁচে থাকার তাগিদেই একাজ করতে পারে না।

যে জমির মধ্যে হাজার হাজার গ্রামের খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব চাষী আটকে রয়েছে, সেই জমিকে নির্ভর করে অর্ধমৃতের মতো হলেও কোনক্রমে জীবনযাপন করছে, ট্র্যাক্টর-মেশিনের সাহায্যে পুঁজিবাদী চাষবাস এখানে চালু করতে গেলে তারা বাড়তি হয়ে যাবে, 'সারপ্লাস' হয়ে যাবে। ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে চাষ শুরু হবার আগেই যে দেশে কাজ নেই বলে বেকার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের কলে-কারখানায় কাজ দেওয়া যাচ্ছে না, আবার যারা কলে-কারখানায় কাজ করছে তাদেরও ছাঁটাই ও লে-অফ হয়ে যাচ্ছে, বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে — এমনই যেখানে শিল্পের অবস্থা, এমনিতেই যেখানে কাজ নেই বলে গ্রামের লোক শহরে চলে আসছে সেখানে ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ করতে গেলে পুঁজিবাদ আর নিজেকে সামাল দিয়ে উঠতে পারবে না। তাই এদেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এই ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখার জন্য 'সবুজ বিপ্লব', 'জাপানি প্রথায় চাষ', 'তাইচুং', 'আই আর-৮' প্রভৃতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নানারকম টোট্‌কার ব্যবস্থা করছে। খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যে কত রকমারি পরিকল্পনা করে কতরকম এবং কত বেশি ফসল ফলানো যায় তারই ভেল্কি দেখানোর নানা রকমের চেষ্টা চরিত্র চলছে। এরই পিছনে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ

করতে পারছে না। আর এটা করতে পারছে না বলেই আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয় — একথা বলা চলে না। পিছিয়ে-পড়া বা অনগ্রসর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে ভেঙেই। কিন্তু পুঁজিবাদ তার নিজের স্বার্থেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে জমিতে আটকে রাখতে চাইছে, বেকার সমস্যা যাতে এমন আকার ধারণ না করে যার ফলে বেকার সমস্যার চাপেই ভেঙে পড়ে রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক গ্রামে যদি এক ধাক্কায় বেকার হয়ে যায় তাহলে এই বিশালাকার বেকারবাহিনী বারুদের মতো ফেটে পড়বে, শহরে-গ্রামে যাকে সামাল দেওয়া কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আমাদের দেশের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পবিকাশের পরিপূরক হিসাবে কৃষিব্যবস্থার পুরোপুরি আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ করা আর সম্ভব নয়। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিতেই অধিকাংশ লোককে অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় আটকে রাখবার চক্রান্ত চলছে। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর দল কংগ্রেসের ভূমিসংস্কারের কার্যক্রম এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্‌গাতাদের ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম এই চক্রান্তেরই নিদর্শন।

এই অবস্থায় গ্রামের অধিকাংশ লোকের তিন মাসের বেশি কাজ জোটার উপায় নেই। যতটুকু কাজ আছে তাতে যা আয় হয় তা তো এক টুকরো 'কানি' আর দু'বেলা খাদ্য জোগাড় করতেই তাদের শেষ হয়ে যায়। ফলে তারা শিল্পজাত দ্রব্য কিনবে কী করে? আমাদের দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তারও আবার পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ লোক হচ্ছে খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী এবং গরিব চাষী। গরিব চাষী পরিবার বলতে আমরা বুঝিয়ে থাকি এমন একটি চাষী পরিবার যার চারজন থেকে ছ'জন ঘরে খাইয়ে, অথচ তার জমির পরিমাণ মাত্র দুই থেকে তিন বিঘে। ভূমিহীন চাষীর তো জমি নেই-ই, খেতমজুরদেরও এতটুকু জমি নেই। অথচ সারা বছর ধরে এদের কোন বাঁধা কাজও নেই। এদের একটা অংশ ফসল বোনা ও ফসল কাটার সময় কাজ করা ছাড়া কখনও ঘর ছাওয়ার কাজ করে, কখনও মুটেগিরি করে, কখনও মাটি কাটে। কী অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় যে তারা দিনযাপন করে, এদেশের গ্রামাঞ্চলে না ঘুরলে তা বোঝার উপায় নেই। এখন এই খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী, গরিব চাষী, আর অল্প কিছু নিম্নমধ্যচাষী, অর্থাৎ যাদের পনেরো বিঘার বেশি জমি নেই — এদের মোট সংখ্যাটা গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা আশি থেকে তিরাশি ভাগ। গ্রামীণ জনসংখ্যার বাকি শতকরা বিশভাগ লোক — পনেরো বিঘার অধিক জমি থেকে শুরু করে শ' শ', হাজার হাজার বিঘা বেনাম জমির মালিক — গোটা দেশের জমির মালিক হয়ে যারা বসে আছে। এদের থেকে আবার মধ্যচাষী অর্থাৎ পনেরো বিঘার উপর থেকে পঞ্চাশ-ষাট বিঘার মালিকদের বাদ দিলে খুব অল্পসংখ্যক লোকই থাকে যারা জোতদারশ্রেণী, ধনীচাষী, রাঘববোয়াল, বেনাম জমির মালিক — যারা নানান নামে আইনকে ফাঁকি দিয়ে দেশের বেশিরভাগ জমি দখল করে বসে আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদের অমোঘ নিয়মে দেশের অধিকাংশ জমি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। জমির এইসব মালিকেরাই ধনী চাষী বা গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা আশিভাগ মানুষ সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারা স্তরে নেমে এসেছে।

এইবার ভাবুন একবার। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ গ্রামে থাকে। সেই গ্রামীণ জনসংখ্যার আবার শতকরা আশি ভাগ লোকের কেনবার ক্ষমতা নেই। তারা অর্ধভুক্ত এবং অভুক্ত। তাদের সারা বছরের কাজ নেই। যতটুকু কাজ আছে তার আয় দিয়ে সারা বছর চলে না, অর্ধেক বছরও চলে না। শহরের দিকে তাকান, দেখবেন, সেখানেও প্রায় একই অবস্থা। শহরের মজুররা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। তাদের বর্তমান আয় টাকার অঙ্কে পূর্বের থেকে হয়তো কিছু বেড়েছে — কিন্তু জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যের অনুপাতে হিসাব করলে দেখা যাবে যে তাদের প্রকৃত আয় ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ফলে মজুরদের যে স্বল্প ক্রয়ক্ষমতা আগে ছিল তাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। তার উপর ঘরে ঘরে বেকার, অর্ধবেকার যুবকে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ভর্তি। আর এই যদি দেশের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে বাজারে ক্রয়ক্ষমতা আসবে কোথা থেকে? মানুষের কেনবার ক্ষমতাই তো বাজারের ক্রয়ক্ষমতা। দেশের মানুষের সেই ক্রয়ক্ষমতাই যদি না থাকে তাহলে মালিকরা মাল তৈরি করবে কেন? বাজার না থাকলে মালিকরা ভোগ্যপণ্য তৈরি করবে কেন? তারা যুদ্ধাস্ত্র ও মিলিটারির অন্যান্য সাজসরঞ্জাম তৈরি করবে — আর সেগুলো কিনবে রাষ্ট্র স্বয়ং। তাই দেখা যাচ্ছে আমাদের বাজেটে প্রতি বছরই প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বাড়ছে, প্রতিরক্ষা শিল্পে অনেক বেশি পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু শিল্পের অন্য কোন ক্ষেত্রে তেমন বিকাশ

হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

শুধু যে পুঁজিবাদী সম্পর্কে ঘুণ ধরেছে তাই নয়, আমাদের পুঁজিবাদ একচেটে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে এবং একচেটে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়ে সে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে। অর্থনীতির এই জটিল কথাগুলিকে আপনাদের বুঝতে হবে। লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে সে ব্যাঙ্কিং পুঁজি এবং শিল্প পুঁজির 'মার্জার'-এর (মিলনের) মধ্য দিয়ে। আর এর ফলেই ভারতবর্ষে 'ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি'র (লগ্নিকারী ধনকুবের গোষ্ঠীর) সৃষ্টি হয়েছে যে সম্প্রদায়টা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্ত মুষ্টিমেয় হলেও ব্যাঙ্ককে, শেয়ার মার্কেটকে, স্টক এক্সচেঞ্জকে কন্ট্রোল করার মধ্য দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্ত জীবনকে 'কন্ট্রোল' (নিয়ন্ত্রণ) করছে। শিল্পজাত সমস্ত পণ্য, এমনকী ছোট ছোট কলকারখানায় এবং স্বল্প পুঁজিকে ভিত্তি করে যে উৎপাদন হচ্ছে সেই সমস্ত কিছুর উপরেও তারা আধিপত্য বিস্তার করেছে। দেশের সমস্ত বাজারটাকে তারা কুক্ষিগত করে রেখেছে। তার মানে মুষ্টিমেয় লগ্নিকারী ধনকুবেরদের রাজত্ব চলছে গোটা অর্থনৈতিক জীবনে যার নাগপাশ থেকে ছোট ছোট কলকারখানার মালিকরাও রেহাই পাচ্ছে না। আমাদের দেশের যুবকদের গল্প শোনানো হয় কবে কে নাকি পাঁচ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করে ছাতু খেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়ে একদিন বড় শিল্পপতি হয়েছিল। ভারতবর্ষের যুবকদের এইসব গল্প শোনানো হয় আর উপদেশ দেওয়া হয় — 'কাজেই তুমিও যদি চেষ্টা কর তাহলে তুমিও এইভাবে একদিন বড় শিল্পপতি হতে পারবে। কারণ আমাদের দেশেই একদিন পাড়ায় পাড়ায় কাপড় বিক্রি করে যারা ব্যবসা শুরু করেছিল আজ তারা বড় বড় গদির মালিক এবং তাদের অনেকেই এক একটা বড় শিল্প কারখানার মালিক। তোমরা আজকালকার যুবকরা, বিশেষ করে বাঙালিরা, তোমাদের ব্যবসায়ে মন নেই এবং তার জন্যই যুবকরা বেকার হয়ে রয়েছে।' এইসব ধাপ্পাবাজেরা কি জানে না যে সে যুগটা অতীত হয়ে গিয়েছে? আজ ব্যবসাক্ষেত্রে পাঁচ টাকার পুঁজি নিয়ে ছাতু খাওয়া পর্যন্তই চলতে পারে। কিন্তু পাঁচ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তার থেকেই কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে পুঁজি সংগ্রহ করে তারপরে একদিন বিড়লা বা মুন্দ্রা হতে হলে জালিয়াতি করা ছাড়া আর দ্বিতীয় রাস্তা নেই। হ্যাঁ, আর একটা রাস্তা আছে। তা হ'ল ওয়াগন ব্রেকারদের দলে নাম লেখাতে হবে। ওয়াগন ব্রেকারদের দল খাড়া করতে পারলে ব্যবসা-ট্যবসার দরকার নেই — পরধন অপহরণ করে পুঁজি সংগ্রহ হতে পারে, তারপর চাই কী রাজা-উজির হয়ে এই সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া চলতে পারে। কিন্তু পাঁচ টাকার পুঁজি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কাপড় বিক্রি করে আর ছাতু খেয়ে পুঁজি সঞ্চ য় করে তারপরে একজন বড় ব্যবসাদারে রূপান্তরিত হওয়া এ যুগে আর সম্ভব নয়। অসম্ভব। এগুলো মিথ্যে ধাপ্পা। আর এই মিথ্যে ধাপ্পায় যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তাটাই আজ আর সাধারণ মানুষের সামনে খোলা নেই। পুঁজিবাদের সে যুগটা আর নেই। যাদের অল্প কিছু পুঁজি রয়েছে তারাই টিকে থাকতে পারছে না। গভর্নমেন্ট উপযুক্ত 'সাবসিডি' (ভর্তুকি) না দিলে, অর্ডার না দিলে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল তার থেকে না কিনলে, ছোট ছোট শিল্পগুলিই টিকে থাকতে পারছে না — এইরকম অবস্থা। আমাদের জানা দরকার যে একচেটে পুঁজিবাদ, লগ্নিপুঁজি এবং ফিনানসিয়াল অলিগার্কির জন্ম হওয়ার মানেই হ'ল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র পুঁজিবাদী-ই নয়, এই পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য খানিকটা হারিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। হতে পারে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে-পড়া ও দুর্বল কিন্তু পুঁজি লগ্নি করার অর্থই হ'ল সাম্রাজ্যবাদ। যেমন আমেরিকা বা ব্রিটেন আমাদের দেশে যে পুঁজি লগ্নি করে, খাটায় তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের শ্রমশক্তি এবং এদেশের কাঁচামালকে ব্যবহার করে এখান থেকে মুনাফা লুটে নিয়ে তাদের নিজেদের দেশের পুঁজিপতিদের পেট মোটা করা। ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের যে লগ্নিপুঁজি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে খাটছে সে কি গান্ধী আশ্রমের কম্বল বিলি করার জন্য? না কি ঐ সকল দেশের সস্তা শ্রমশক্তি এবং সস্তা কাঁচামালকে ব্যবহার করে মুনাফা লুটে আনার এবং ভারতের লগ্নিকারী ধনকুবের গোষ্ঠীর ধনকে আরও স্ফীত করবার জন্য? কাজেই তাদের ধন এই প্রক্রিয়ায় স্ফীত হচ্ছে। দেশের বাজার লুণ্ঠন করে এবং বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করে কারবার করে যে পরিমাণ পুঁজি সঞ্চ য় হচ্ছে দেশের মধ্যে তার দ্বারা কী নতুন নতুন উদ্যোগ হচ্ছে? দেশের অভ্যন্তরে শিল্পোন্নয়নের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে? বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে? না, হচ্ছে না। কিন্তু টাকা বাড়ছে তো, সম্পদ বাড়ছে তো? সেটা বাড়ছে তাহলে কার ঘরে? কার সম্পদ বাড়ছে?

ধনকুবেরদের ধন বাড়ছে। একেই আমি বলি পুঁজিবাদ। এ কেবল পুঁজিবাদই নয়, এ পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই

একচেটে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে সে সম্পর্কে যাঁর সঠিক ধারণা আছে তিনিই বুঝতে পারবেন সাম্রাজ্যবাদ কী। লগ্নিপুঁজি বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফিনান্স ক্যাপিটাল' সেই ফিনান্স ক্যাপিটালের কারবারকেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলি। আর তাই যদি বলি তবে ভারতবর্ষে একচেটে পুঁজিরই শুধু জন্ম হয়নি, ভারতের শিল্পপুঁজি বৃহৎ শিল্পপুঁজিতে অর্থাৎ একচেটে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে একটি ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে যাকেই ইংরেজিতে আমরা বলি ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি। এখন এই ধনকুবের গোষ্ঠী বা ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি কথাটার মানে কী? আগে ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্প পুঁজি আলাদা ছিল। একে অপরকে সাহায্য করেছে, সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এ দুটোকে 'ইন্টিগ্রেটেড' অবস্থায় একটা গোষ্ঠী পরিচালনা করত না। কিন্তু আজ পুঁজিবাদ একচেটে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হবার পর ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্প পুঁজির চূড়ান্ত মিলন ঘটেছে এবং এই মিলনের মধ্য দিয়ে এমন একটি শক্তিশালী ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে যাকে আমরা অর্থনীতির ভাষায় ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি বলি। রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিরও জন্ম হয়েছে এবং এইভাবে রাষ্ট্রকে একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত করা হয়েছে ও ক্রমশই আরও বেশি করে করা হচ্ছে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের ধনকুবের গোষ্ঠীর লগ্নিপুঁজির কারবার — এ সকল কিছুকে এক সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্রটিকে বুঝতে হবে। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ যে ইতিমধ্যেই খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে তা সম্যক বুঝতে হলে এখানে আর একটা বিষয়ও আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। সেটা হ'ল এই পুঁজির রপ্তানি বা 'এক্সপোর্ট অফ ক্যাপিটাল' কথাটার দ্বারা অর্থনীতিতে কী বোঝায়। আমাদের দেশে যেসব পণ্য উৎপাদিত হয় তা রপ্তানি করা এক চরিত্র। সে সব দেশই করে। নিজের দেশের শিল্পবিকাশের জন্যই তার দরকার। পুঁজিবাদের এটা একটা বিশেষ চরিত্র। কিন্তু এই চরিত্রটি থাকলেই সাথে সাথে একটি পুঁজিবাদী দেশ সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যায় না। পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করতে করতে যখন এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যে স্তরে সে শুধু পণ্য রপ্তানিই করে না, পুঁজিও রপ্তানি করতে থাকে তখন তাকেই আমরা অর্থনীতির ভাষায় বিদেশের বাজারে লগ্নিপুঁজির কারবার, বা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বলি। পণ্যের রপ্তানির সঙ্গে পুঁজির রপ্তানির একটা মৌলিক চরিত্রগত পার্থক্য আছে। বিদেশের বাজারে লগ্নিপুঁজির কারবারের মধ্য দিয়ে রপ্তানিকারী দেশের পুঁজিপতিরা সে দেশের শ্রমশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করে, যেটা পণ্যের রপ্তানির মধ্য দিয়ে ঘটে না। এইখানেই পণ্য রপ্তানির সাথে 'এক্সপোর্ট অব ক্যাপিটাল'-এর (পুঁজি রপ্তানির) প্রকৃতিগত পার্থক্য। তাই বিদেশের বাজারে পুঁজির রপ্তানিকেই অর্থনীতির ভাষায় সাম্রাজ্যবাদ বলে। ভারতবর্ষও পুঁজি রপ্তানি করছে তা সে 'মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন'-এর নামেই হোক, আর যে নামেই হোক্। নাম যাই হোক্ ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরাও বিদেশের বাজারে পুঁজি রপ্তানি করছে, বিদেশের বাজারে লগ্নিপুঁজির কারবার করছে — এটাই আসল কথা, মূল কথা।

যেহেতু ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর বড় রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে এবং বড় রাষ্ট্রগুলোরও কিছু অতিবৃহৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আজ মিলেমিশে লড়তে হচ্ছে তাই তারা একটি নতুন 'ফর্ম'-এ (ঢং-য়ে) এই দেশের সমস্ত পুঁজির সংমিশ্রণ ঘটাতে চাইছে। আর এই যে জাতীয় গণ্ডির বাইরে এক দেশের পুঁজির আর এক দেশে যাওয়া, এক দেশের পুঁজির আর এক দেশের পুঁজির সঙ্গে মিলন — যাকে ইংরেজিতে 'কস্‌মোপলিটানিজম' বলে — তারই নাম দিয়েছে ওরা আজকের দুনিয়ায় 'মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন'। কিন্তু যতক্ষণ এর ভিত রয়েছে পুঁজিবাদ, অর্থাৎ যতক্ষণ একচেটে পুঁজি এবং ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি এর পিছনে কাজ করছে, লগ্নিপুঁজির ভিত্তিতে এটা হচ্ছে তখন নাম এর যাই হোক্ — এ সেই পুরনো 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল'-এরই অনুরূপ একটা নতুন 'অ্যারেঞ্জমেন্ট' (বন্দোবস্ত) মাত্র, এবং এটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকেই প্রতিফলিত করছে। একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এদেশের পুঁজিবাদ শুধু প্রতিক্রিয়াশীলই নয়, ইতিমধ্যেই সে খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। উপরন্তু এ হচ্ছে সেই ধরনের পুঁজিবাদ যে প্রগতির গলা টিপে ধরছে — জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থনীতি-রাজনীতি থেকে শুরু করে শিল্পসাহিত্য, নীতিনৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে এরই জন্য আজ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। একে কেবলমাত্র 'ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ' বললে সবটুকু বোঝা যায় না। এর সাথে আমাদের দেশের পুঁজিবাদের বিশেষ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকুও আপনাদের লক্ষ্য করা দরকার। বিশ্বের সর্বত্রই আজ পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছবার পর একদা তাদেরই দ্বারা তুলে ধরা মানবতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে তারা নিজেরাই আজ ক্রমাগত

পদদলিত করে চলেছে এবং দিনের পর দিন 'ব্যুরোক্রেসি', দমননীতি, জোরজুলুম ও সমরবাদের প্রতি ক্রমেই বেশি বেশি করে পক্ষপাতী হয়ে উঠছে। এই ঘটনা শক্তি ও অবস্থার তারতম্য অনুসারে আজকাল সকল পুঁজিবাদী দেশেই কমবেশি ঘটছে। কিন্তু আমি যে কথাটা আপনাদের বলতে চাই, তা হচ্ছে, আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার মূল্যবোধের প্রতি যে চূড়ান্ত অবজ্ঞা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যে চরম দুর্নীতি আজ সর্বাত্মক রূপ ধারণ করেছে, ইউরোপের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ঝানু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও তার নজির মিলবে না। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে নিজেদেরই তৈরি আইনকানুনের প্রতি এহেন অমর্যাদা প্রদর্শনের নজির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক হয়ে এদেশের পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃক আইনের মর্যাদা লঙ্ঘন এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের বেশিরভাগ লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ, আক্রোশ অথবা শাসকদলের প্ররোচনায় বিনা দ্বিধায় যেভাবে বে-আইনি কার্যকলাপে লিপ্ত এবং যেভাবে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের তারা প্রায়শই হয়রানি করে থাকে তার নজিরও কোন পশ্চিমের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মিলবে না। এই সবের ফলে সমাজের সর্বস্তরে কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধের প্রতি একটা সর্বাত্মক অবজ্ঞার ভাব সমাজজীবনে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। আমেরিকায় যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সর্বপ্রকার ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে চরম পাশবিক উপায়ে গোটা ভিয়েতনামকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার হীনতম চক্রান্ত করল সেই দেশের বুর্জোয়াদের জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া জাতীয় জীবনের পূর্বোক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির পার্থক্য লক্ষণীয়। একথা ঠিক যে নিজেদের শ্রেণীশাসন এবং শোষণের স্বার্থে মানুষকে গলা টিপে পদানত করা এবং মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষেত্রে কোন দেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীই কার্পণ্য করে না। কিন্তু একথাও ঠিক যে ঐসব পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী এবং বুর্জোয়ারা, যারা বিশ্বজোড়া 'আন্ডারওয়ার্ল্ড অ্যাকটিভিটি'-র হোতা এবং দুনিয়াজোড়া নানা অপরাধমূলক কার্যকলাপে সর্বদাই লিপ্ত, তারাও কিন্তু শিশুখাদ্য এবং ওষুধে ভেজাল মেশাতে জানে না বা নিজেদের দেশে এরূপ কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয় না। তারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হাজার অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলেও কেউই নিজেদের দেশে কর্ম ও কর্তব্যে 'নেগলেক্ট অব ডিউটি'কে (অবহেলাকে) প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু আমাদের দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও বুর্জোয়ারা শিশুখাদ্য এবং ওষুধের মত জিনিসে ভেজাল মেশাতেও বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করে না। যে বেবিফুড তার ঘরের ছেলেটিও খাবে, যে ওষুধে তার নিজের প্রাণও রক্ষা হবে, এ দেশের ব্যবসাদাররা তাতে পর্যন্ত ভেজাল মেশায়।

তাহলে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং দুনিয়াজোড়া নানা অপরাধমূলক কাজে সদা লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশগুলির বুর্জোয়ারা আজও কেন এই ধরনের হীন কাজের কথা ভাবতে পারে না? এর কারণ এইসব দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সামন্ততন্ত্র ও সর্বপ্রকার ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবাত্মক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। তখনকার দিনে পুঁজিবাদী বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে যে মানবতাবাদী আদর্শকে ভিত্তি করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুত্থান ঘটেছিল তা ছিল 'সেক্যুলার' মানবতাবাদ। 'ম্যানহুড'কে ভিত্তি করে সে সমাজের মূল্যবোধের কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। যদিও পরবর্তীকালে ইউরোপীয় মানবতাবাদ 'এসেন্স অব ক্রিশ্চিয়ানিটি'র (খ্রিস্টধর্মের মূল সুরের) সাথে একটা আপসরফা করে নিয়েছিল — তবুও রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সেক্যুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতেই তার জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে উঠতে পেরেছিল। এত অপকর্মের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে আজও পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাই আমাদের দেশের মতো সর্বত্র, বিশেষ করে প্রশাসনিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আজও তারা কর্তব্যকর্মে অবহেলাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই আন্ডারওয়ার্ল্ড অ্যাকটিভিটি এবং বিশ্বজোড়া অপরাধমূলক কার্যকলাপের নায়ক হওয়া সত্ত্বেও বেবিফুড এবং ওষুধে ভেজাল মেশানোর মতো হীন পন্থায় মুনাফা লোটার কথা তারা আজও ভাবতে পারে না। আপনারা জানেন যে পশ্চিম জার্মানিকে আমরা সকলেই একটা 'ফ্যাসিস্ট-ক্যাপিটালিস্ট' দেশ হিসাবে মনে করে থাকি। কিছুদিন আগে খবরের কাগজের একটি সংবাদে জানা যায় যে সেই পশ্চিম জার্মানির কোন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে আমাদের দেশের একজন ব্যবসায়ী পাথরের চাল তৈরি করার একটি মেসিন বানাবার অর্ডার দিয়েছিল। টাকার বিনিময়ে পশ্চিম জার্মানির ব্যবসাদাররা

ইচ্ছা করলেই ঐ মেসিন তৈরি করে দিতে পারত। কিন্তু তা তারা দেয়নি। কারণ অনেক অপকর্ম করলেও এ ধরনের অপকর্মের কথা তারা কখনও শোনেনি। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর জন্য পাথরের চাল বানানোর মেশিন তৈরি করে দিতে হবে, এরকম একটি বিচিত্র অপকর্মের যে অর্ডার হতে পারে, এ তারা ভাবতেই পারেনি। তাই ঘটনাটা তারা আমাদের দেশের সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে তারাও ব্যবসা করে, লাভ করে, মানুষকে ঠকায়, আন্ডারওয়ার্ল্ড অ্যাকটিভিটি তাদেরও আছে — কিন্তু তা সত্ত্বেও পাথরের চাল তৈরি করার মেসিন বানিয়ে বিক্রি করার মতো দুর্বুদ্ধি আজও তাদের মাথায় ঢোকেনি। আর আমাদের দেশের সরকার খাদ্যে ভেজাল মেশানোর জন্য পাথরের চাল তৈরি করার মেশিন বানাবার অর্ডার যে ব্যাটা দিল তাকে ধরে প্রকাশ্য আদালতে বিচার করার বদলে ঘটনাটাই বেমালুম চেপে গেল। উপরন্তু তাকে হয়তো এইজন্য ঘরে ডেকে নিয়ে খানা খাইয়েছে এবং ভেবেছে এত বড় একটা 'ব্রেন'কে প্রশাসনের কোন কাজে লাগানো যায় কিনা। এই হ'ল আমাদের দেশের বুর্জোয়াদের চরিত্র। শুধু 'বুর্জোয়া' বললে এদের বোঝানো যায় না। বিচিত্র এদের প্রকৃতি যার সঙ্গে ইউরোপের বুর্জোয়াদের অমিল। ঐ সমস্ত দেশের পুঁজিপতি এবং ব্যবসাদার ও আমাদের দেশের পুঁজিপতি এবং ব্যবসাদারদের হীনতার মধ্যেও এই যে পার্থক্যটুকু রয়েছে তা লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

আমাদের দেশের বুর্জোয়া জাতীয় চরিত্র এবং ঐ সব দেশের বুর্জোয়া জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এই যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তার কারণ কী? কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের মতো এদেশের পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্র, ধর্ম ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই কারণে আমাদের দেশের বুর্জোয়া জাতীয় চরিত্রের কোন সুদৃঢ় ভিত্তিই গড়ে উঠতে পারেনি। আমাদের দেশের পুঁজিবাদ প্রথমত গড়ে উঠেছে বিশ্ব পুঁজিবাদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল যুগে। দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করে এবং তাদের সঙ্গে সংমিশ্রণে আমাদের দেশে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছে। ফলে সুদূর অতীতকাল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন, জাতপাত ও নানা ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কারে এদেশের অধিবাসীদের মেরুদণ্ড যেখানে এমনিই বেঁকে গিয়েছিল সেখানে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে জাতপাত ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা অংশের মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন এলেও সেই ধারাটি কিছুদূর এগিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ফলে সমাজজীবনের অভ্যন্তরে যে ক্লেদ জমে ছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলন আপসমুখী হওয়ার ফলে যা দূর করা সম্ভব হয়নি, স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাই চূড়ান্তভাবে আজ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই তো গেল ভারতীয় পুঁজিবাদের বিশেষ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিকটি।

এখন রাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই রক্ষক হয়ে থাকে তাহলে ভারত রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের যে মহিমা, সংবিধানের যে মহিমাই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এটা আসলে ভারতবর্ষের দুর্ধর্ষ ও চরম দুর্নীতিপূর্ণ একচেটে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার এবং একে রক্ষা করার সশস্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া আর কী হতে পারে? আর পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা রক্ষা করার যন্ত্রকে ইতিহাসে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছাড়া আর কী বলে? এই জন্যই আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিকে একটি আধুনিক ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র বলি। এটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র — যে রাষ্ট্র পুঁজিবাদকে সংরক্ষণ করছে, পরিবর্ধনে সাহায্য করছে। আর এটা কী ধরনের পুঁজিবাদ? যে পুঁজিবাদ আজ আর শিল্পবিপ্লব ঘটাতে পারে না, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কৃষির আধুনিকীকরণ করতে পারে না, যে শুধুমাত্র লগ্নিপুঁজি খাটিয়ে বিদেশের বাজার লুণ্ঠন করতে পারে, আর অল্প জিনিস তৈরি করে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেশের মানুষের রক্ত চুষে চুষে হাড় জিরজিরে করে দিতে পারে। যদি বুঝতাম এটা পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের পুঁজিবাদ, যে শিল্পবিপ্লব ঘটাচ্ছে, কৃষির আধুনিকীকরণ করছে এবং গ্রামীণ বেকারদের শহরে নিয়ে আসছে, কলে-কারখানায় নিত্যনতুন কাজ দিচ্ছে, শিল্প-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধন করছে — তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু এ হচ্ছে সেই পুঁজিবাদ যে প্রগতির গলা টিপে ধরছে — জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবাদ — সবকিছুকে গলা টিপে মারছে। এ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু এবং অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত একটি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ। তাই আমাদের সমাজজীবনে এত অবক্ষয়, নানান দিকে এত দুর্দশা। কাজেই ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকে শঙ্করাচার্যের মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে এদেশের যুবকরা বাঁচতে পারেন না। তাঁরা যদি তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চান, এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে তাঁদের

এই প্রশ্নটিকে সরাসরি মোকাবিলা করতে হবে।

বিভিন্ন মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত আরও বেশ কয়েকটি যুবসংগঠন এদেশে আছে। তাদের মধ্যে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর দল কংগ্রেসের যুবসংগঠনের কথা বাদ দিলে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) পরিচালিত দু'টি যুবসংগঠনের কথা স্বভাবতই আসে। বক্তব্যের একটু রকমফের বাদ দিলে এই দু'টি সংগঠনই বলছে যুবকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং যুব সমস্যার সমাধানের প্রধান কার্যক্রম নির্ধারিত হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা যাঁরা বলছেন তাঁরা মূলত এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব সত্যটাকেই অস্বীকার করতে চাইছেন, চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাইছেন। তাঁরা বলছেন সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদকে হটানোই আমাদের দেশের প্রথম এবং প্রধান কাজ — অর্থাৎ ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম ও প্রধান কাজ নয়, প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের যে অর্থনৈতিক শোষণ আমাদের দেশের উপর রয়েছে সেগুলোকে হটানো এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ যতটুকু রয়েছে — কতটুকু রয়েছে তা তাঁরাই জানেন — তাকে হটানো! কিন্তু আজ আমাদের দেশের ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নেই। যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস হচ্ছে না বলে এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ হয়নি বলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ রয়েছে বলে তাঁরা বলেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে, বিশেষ করে বিশ্বপুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র বিশ্বজোড়া সঙ্কটের যুগে পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদ কীভাবে কৃষিতে অনুপ্রবেশ করছে তাই তাঁরা বোঝেন না। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি জনগণতান্ত্রিক এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এইসব প্রবক্তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদ যেভাবে কৃষিতে অনুপ্রবেশ করেছিল তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, বিশেষ করে বিশ্বপুঁজিবাদের তৃতীয় ঘনীভূত সঙ্কটের যুগে আমাদের দেশে পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদ আজ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে — তাকে মিলিয়ে বিচার করতে গিয়ে গোটা বিষয়টিকেই গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এরই ফলে তাঁরা আধুনিক শোধনবাদ বা বুর্জোয়া জাতীয় সংস্কারবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।

যদিও কৃষি অর্থনীতির বাস্তব স্থিতি বিচার করতে গিয়ে তাঁরাও স্বীকার করছেন যে, কৃষি অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে।[১] আবার সাথে সাথেই তাঁরা স্লোগান তুলছেন ট্র্যাক্টর-মেশিন দিয়ে চাষবাস, অর্থাৎ কৃষির যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা চলবে না, কারণ কৃষকরা বেকার হয়ে যাবে। তার জন্য কৃষকদের সংগঠিত করে ট্র্যাক্টর-মেশিনের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।[২] অদ্ভুত!

ঠিক এই কথাটাই বলছে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী ও তাদের দল কংগ্রেস, যারা বেকার সমস্যার সমাধান করতে না পেরে বেশিরভাগ গ্রামীণ মানুষকে আটকে রাখতে চাইছে জমির মধ্যে। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী আজ এই পথে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজছে। অথচ যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন তাঁরাও তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রোগ্রামে চাষীদের সংগঠিত হতে বলছেন ট্র্যাক্টর-মেশিনের প্রচলন বন্ধ করার জন্য। কারণ তাহলে নাকি বেকার বৃদ্ধি হবে। আমি বলি হবেই তো। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে 'ট্র্যাক্টর-মেশিনের প্রচলন বন্ধ করতে হবে' — এই স্লোগানের মানে কী? বর্তমান অবস্থায় এ তো গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার চাপ থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার স্বার্থেই যতটা সম্ভব ট্র্যাক্টর-মেশিনের প্রচলন রোধ করে টুকরো টুকরো জমিতে বেশিরভাগ মানুষকে আটকে রাখার পুঁজিপতিশ্রেণীর পরিকল্পনারই নামান্তর। গ্রামাঞ্চলে গরিব চাষী ও খেতমজুরদের দৈনন্দিন সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে এবং তাদের নিয়ে বেকারিবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে ট্র্যাক্টর-মেশিনের প্রচলনের বিরুদ্ধে চাষীকে সাময়িকভাবে কোথাও যদি সংগঠিত করতেও হয় তাহলেও চাষীকে তো এই কথাটাই বোঝাতে হবে যে কৃষির যন্ত্রীকরণের সাথে জনসাধারণের স্বার্থের কোন বিরোধ নেই, বরং এটা সমাজ অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আজ আর এটা করবার উপায় নেই। ফলে কৃষি অর্থনীতিকে যদি এই পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করতে না পারা যায়, পুঁজিবাদী-সম্পর্ক থেকে যদি শিল্পকে মুক্ত করতে না পারা যায় এবং এই পথে শিল্পবিপ্লবের দ্বার খুলে দিতে না পারা যায় তাহলে কিছুতেই কৃষিতে আধুনিকীকরণ ও সামগ্রিকভাবে যন্ত্রীকরণ করা যাবে না এবং গ্রামীণ জীবনে জনসাধারণের দুর্দশা এবং দারিদ্র্যের লাঘব হবে না। তাই বর্তমান অবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত না করে মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তন করতে গেলে গ্রামের খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব চাষীদের একটা বিরাট অংশ কর্মচ্যুত হবে

বলে এবং তাদের বিকল্প কর্মের কোনরূপ সংস্থান নেই বলে — 'হয় বিকল্প কাজ দাও, না হয় মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করতে দেব না' — এর ভিত্তিতে একটা প্রতিরোধ আন্দোলন হতে পারে মাত্র। কিন্তু 'ট্র্যাক্টর-মেশিনের প্রচলনকে রুখব' — এরকম আন্দোলন শেষপর্যন্ত শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল হতে পারে না। কাজেই যদি কোথাও দৈনন্দিন সংগ্রামের কর্মসূচি হিসাবে ট্র্যাক্টর-মেশিন প্রচলনের বিরুদ্ধে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ ও চাষীকে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করতে হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষীকে সচেতন করা যে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব যদি ত্বরান্বিত করতে না পার তাহলে তোমাদের সমস্যার সমাধান নেই। আজ হোক্ কাল হোক্ এটা আসবে। কিন্তু ওঁরা বলছেন যে মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে এবং একে যুক্ত করতে হবে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করার আন্দোলনের সঙ্গে — পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবের কর্মসূচির সঙ্গে নয়! সামন্ততন্ত্রের জন্য মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তন করতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি? তাহলে মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তন করলেই তো সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ হবে। সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি তো মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রচলনের পথেই দ্রুততম হয়। কী ধরনের স্ব-বিরোধী কথা দেখুন! সি পি আই (এম) মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু না করতে দেওয়ার আন্দোলনকে 'ল্যান্ডলর্ডইজ্‌ম্' (জমিদারতন্ত্র), অর্থাৎ ওদের প্রোগ্রামের ভাষায় সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। কী অদ্ভুত সব তত্ত্ব! এ তো গ্রামীণ জীবনে ক্রমবর্ধমান বেকারের চাপ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজিবাদী ভূমিসংস্কারের কার্যক্রমেরই প্রায় অনুরূপ। তাই বলছিলাম এদের এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি নয়া শোধনবাদী বা বুর্জোয়া জাতীয় সংস্কারবাদী কার্যক্রমেরই রকমফের মাত্র। এর ফলে রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল প্রশ্নটিকেই গোলমাল করে ফেলা হচ্ছে।

আবার দেখুন এরা বলছে ভারতবর্ষ একটি জাতীয় রাষ্ট্র। ভারত যদি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রই হয় তাহলে সেটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র ছাড়া আর কী? এবং এটা যদি আধুনিক ধরনের রাষ্ট্র হয় তাহলে এটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হতে পারে? কাজেই পুঁজিপতিশ্রেণীকে অর্থাৎ শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করা — এই প্রশ্নগুলির সাথেই কৃষির আধুনিকীকরণের এবং যন্ত্রীকরণের ও জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের প্রশ্নগুলি জড়িত হয়ে রয়েছে, শিল্পবিপ্লবের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। আর এই প্রশ্নগুলির সঙ্গেই জড়িত রয়েছে বেকার সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি। অথচ সি পি আই (এম) এবং সি পি আই —দু'দলই বলছেন কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ, শিল্পবিপ্লব, বেকার সমস্যার সমাধান ও জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের প্রশ্নগুলি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদের বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত নয়; এগুলো নাকি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এইভাবে তাঁরা শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীকে জনগণের ক্রোধ ও ঘৃণা থেকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাবে যে এরা বারবারই তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং কখনও কখনও এমনকী কাল্পনিক শত্রু খাড়া করে মূল শত্রু ও মূল প্রশ্নগুলি থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তা সে যাই হোক, যে প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলাম তাতেই ফিরে আসা যাক। বেকারদের আপনারা কাজ দিতে পারবেন কখন? যখন শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলে দিতে পারবেন। কিন্তু কখন আপনারা শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলে দিতে পারবেন? যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে পারবেন। এইভাবে যখন শিল্পবিপ্লবের অবরুদ্ধ দ্বার খুলে দিতে পারবেন কেবলমাত্র তখনই কৃষির আধুনিকীকরণ করতে পারবেন। তখনই অফুরন্ত কর্মসংস্থান করতে পারবেন এবং ঘরে ঘরে যুবকদের কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। তাই যাঁরা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কথাটি, অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার কথাটি এড়িয়ে গিয়ে বাজার গরম করার জন্য একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছেন, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাল্টে ফেলবার বিপ্লবের কথাটি অস্বীকার করছেন, এবং ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ যে ইতিমধ্যেই খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে তাকেই অস্বীকার করতে চাইছেন, তাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব — যে বিপ্লবের(!) উপাসকই হোন না কেন তাঁদের বিপ্লবের(!) কর্মসূচি বা 'স্ট্র্যাটেজিক প্রোগ্রাম' আসলে একটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী প্রোগ্রাম এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ালড়িগুলিকেই বিপ্লব আখ্যা দিয়ে শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে সরকারি গদি দখলের কর্মসূচি মাত্র।

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ও গ্রামীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাস, আচার-আচরণ প্রভৃতির জের টেনে চলা ছাড়া ভূমি-সম্পর্ক ও কৃষি উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক কোথায় রয়েছে? শোধনবাদী ও নয়াশোধনবাদীরা যাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন তাঁরাই আবার বলছেন কৃষিতে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক না ভেঙে কৃষিতে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে নাকি ? তাহলে তো ওদের থিয়োরি অনুযায়ী ব্যাপারটা এরূপ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ জিইয়ে রাখার মধ্য দিয়েই কৃষিতে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। সি পি আই (এম) আবার আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আমাদের জবাব দিতে গিয়ে এমন কথাও বলেছেন যে একচেটে পুঁজিপতিদের শোষণ যত জোরদার হচ্ছে এবং তাদের ধনসম্পদ যত স্ফীত হচ্ছে, সামন্ততন্ত্রও নাকি ততই জোরদার হচ্ছে।[৪] অদ্ভুত সব স্ববিরোধী কথা! আসল কথা হচ্ছে বুর্জোয়াদের গায়ে হাত দেব না। জনগণের আক্রমণ থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের আড়াল করতে হবে। কারণ জাতীয় বুর্জোয়াদের এক অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে দলটি পুষ্ট হয়েছে এবং এখনও পুষ্টিলাভ করে চলেছে। সমাজের 'হাই-আপ্‌স্'-দের (উঁচুস্তরের মানুষদের) সঙ্গে তাদের সংযোগ এবং সম্পর্ক লক্ষ্য করলে একথা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই তাঁদের সবসময়েই চেষ্টা করতে হবে যাতে জনগণ না গোটা বুর্জোয়া সমাজের ওপর খেপে যায়। আবার জনসাধারণকে দলের পিছনে টেনে আনতে গেলে বিপ্লবের কথাটাও বলতে হবে। তাই শুধু 'একচেটে পুঁজিপতি' এবং 'বৃহৎ বুর্জোয়া', 'বৃহৎ বুর্জোয়া' বল। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর দল কংগ্রেসও প্রায় ঠিক অনুরূপ কায়দায় মুষ্টিমেয় একচেটে পুঁজিপতিদের ঘাড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন ও শোষণের সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীকেই জনতার আক্রমণের হাত থেকে আড়াল করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। তাই যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের মুখেও একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে স্লোগান লেগেই আছে। তা সে যাই হোক্ সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা বলছেন একচেটিয়া পুঁজিপতি বা বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লব। ভাল কথা। কিন্তু আপনারাই তো বলছেন এই বৃহৎ বুর্জোয়ারাই হচ্ছে 'বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বুর্জোয়াজি' (বৃহৎ শিল্প পুঁজিপতি), অর্থাৎ এরাই আমাদের দেশের একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠী। তাহলে আমাদের দেশের এইসব একচেটে পুঁজিপতিরা তো আর প্রাক্ বিপ্লব চীনের মতো 'কম্প্রাডর' (মুৎসুদ্দি) নয়। ভারতবর্ষের শিল্পপুঁজিই একচেটে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এমতাবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে একচেটে পুঁজির শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির অন্য কোন উপায় আছে কি? সি পি আই (এম) কর্মী ও সমর্থকদেরও কথাগুলি ভেবে দেখতে বলছি।

তাই দেখা যায় আমাদের দেশের একচেটে পুঁজিপতি বা বৃহৎ বুর্জোয়াদের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমঝোতার চরিত্র বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ার ফলেই শোধনবাদীরা 'বৃহৎ বুর্জোয়াদের' একবার বলছেন 'কোলাবরেটর', আবার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও কিছু কিছু রাজনৈতিক প্রশ্নে সংঘাত দেখে এই সংঘাতের চরিত্রকে প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক বলে মনে করছেন। সি পি আই (এম) তাঁদের পার্টির স্ট্র্যাটেজিক প্রোগ্রামে, অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে বলেছেন ভারতের একচেটে পুঁজিপতি বা বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের শুধু দ্বন্দ্বই বর্তমান নয়, 'কন্‌ফ্লিক্ট'ও (সংঘাতও) রয়েছে এবং হামেশাই সংঘাত ঘটছে। তাঁদের মতে এই সংঘাতের বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে 'যুদ্ধ', 'শান্তি', 'জাতীয় স্বাধীনতা', 'সার্বভৌমত্ব', 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থ' প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় 'বৃহৎ বুর্জোয়াদের' যে বিরোধ রয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে শাসক বুর্জোয়াদের প্রতি শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত জনসাধারণের 'আন্‌স্টিন্‌টেড সাপোর্ট' (অকুণ্ঠ সমর্থনের) আশ্বাস[৫] জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্গাতারা দিয়েছেন! এই যদি ব্যাপার হয় তাহলে তো যে বৃহৎ বুর্জোয়া বা একচেটে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তাঁরা হুংকার দিচ্ছেন, তাঁদের পার্টি প্রোগ্রামের ১০৮ অনুচ্ছেদে উপরিউক্ত বক্তব্যের দ্বারা আবার সেই 'বৃহৎ বুর্জোয়া' বা একচেটে পুঁজিপতিদেরই প্রগতিশীল, জাতীয় এবং দেশপ্রেমিক বলে মনে করা হয়েছে। কারণ 'বৃহৎ বুর্জোয়া' বা একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে যদি তাঁরা 'প্রগতিশীল', 'জাতীয়' এবং 'দেশপ্রেমিক' বলে মনে না করে থাকেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ বুর্জোয়াদের' বা একচেটে পুঁজিপতিদের গভর্নমেন্টকে 'অকুণ্ঠ সমর্থন' জানানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে তাও তাঁরা বলে বসে আছেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে শোধনবাদী সি পি আই-কেও তাঁরা এ

ব্যাপারে এক পা পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন। আমি পূর্বের আলোচনাতেই দেখিয়েছি তাদের বিপ্লবের কর্মসূচি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে এটা আসলে বিপ্লবী বাগাড়ম্বরের আড়ালে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়ে কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তনের কর্মসূচি মাত্র। অর্থাৎ এই ব্যবস্থাটার মধ্যেই, এই রাষ্ট্র-কাঠামোটার মধ্যেই তাঁদের নেতৃত্বে একটা সরকার গঠন হলেই সেটা জনগণতান্ত্রিক সরকার হয়ে গেল এবং সেই সরকার রাষ্ট্রকাঠামোর কিছু কিছু সংস্কার সাধন করলেই সেটা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল।ঁ অর্থাৎ তাঁদের মতে এই পথেই ধীরে ধীরে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হবে। এইসব কার্যক্রমের সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্পর্ক কী? এ সব কিছু তো ইলেকশনের মধ্য দিয়েই করার বিষয়। আর এইরকম যাঁদের প্রোগ্রাম তাঁরা জনসাধারণের মৌলিক সমস্যাগুলি এবং যুবসমস্যা ও বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, কী করে তার নেতৃত্ব দেবেন?

এখন দেখা যাক যুবকদের মূল সমস্যাগুলো কী? প্রথমত সমাজ অভ্যন্তরে যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তার হাত থেকে তাদের রক্ষা করে সর্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য নৈতিক বল এবং সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করার উপযোগী সহিষ্ণুতা গড়ে তুলতে পারে যে আদর্শবাদ সেই আদর্শবাদে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। এখন সমাজ অভ্যন্তরে এই যে ভয়াবহ সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটছে, মনে রাখতে হবে, এটাও ঘটছে মূলত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদেরই জন্য। আমরা শুধু যে না খেয়ে আছি, চাকরি পাই না, বা শিক্ষার মান ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তাই নয় — এই সমস্ত সমস্যাগুলির মধ্যে সবচাইতে বড় সমস্যা হ'ল জনজীবনে যুবজীবনে নৈতিকতা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে আজ চূড়ান্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সমাজজীবনে এই যে সর্বাত্মক নৈতিক অধঃপতন আজ মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, নানাভাবে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে এবং তাকে হাতিয়ার করেই এদেশের ক্ষমতাসীন শাসক-শোষক বুর্জোয়াশ্রেণী গোটা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে। কারণ নৈতিকতা এবং আদর্শবাদের মান উঁচু হলে মানুষ পর্যুদস্ত অবস্থাতেও প্রকৃত মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আর যদি সেটা না থাকে তাহলে মানুষ, মানুষ হয়েও পশুর মতো আচরণ করে, জন্তু-জানোয়ারের মতো আচরণ করে। তাই ওরা যে শুধু শোষণই করছে তাই নয় — মানুষের মধ্যে লোভ, ভয়, কাপুরুষতা, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা, উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব প্রভৃতি যে নীচ প্রবৃত্তিগুলি রয়েছে সেগুলিকে ওরা ক্রমাগত প্রশ্রয় দেওয়া এবং বাড়িয়ে তোলার চক্রান্ত করে চলেছে।

কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ কায়েম হয়ে আছে বলেই অবধারিতভাবে ক্রমাগত সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটতে থাকবে — কোনমতেই এরকম নয় ব্যাপারটা। অথবা নৈতিক মানের এহেন চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটেছে বলে আর তা কোনদিনই উন্নত স্তরে পৌঁছুতে পারে না — এ ধারণাও অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক, 'ফ্যাটালিজ্‌ম্' (অদৃষ্টবাদ) এবং এক ধরনের নৈরাশ্যবাদেরই পরিচয় দেয় এবং এর দ্বারা সমাজ অভ্যন্তরে বিরুদ্ধ শক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়, অথবা খাটো করে দেখা হয়। সর্বদাই মনে রাখতে হবে সমাজ অভ্যন্তরে ভাবসত্ত্বা, বস্তুসত্ত্বার একটা যান্ত্রিক অভিব্যক্তি বা প্রতিফলন মাত্র নয়। ভাবসত্ত্বা, বস্তুসত্ত্বার উপরিকাঠামো বলে ভাবসত্ত্বার মধ্যেও দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তি বর্তমান এবং ভাবসত্ত্বা ও বস্তুসত্ত্বার পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বান্দ্বিক হওয়ার ফলে ভাবসত্ত্বাও বস্তুসত্ত্বার ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তাই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বস্তুগতভাবে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণ হলেও এবং বুর্জোয়াশ্রেণী নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে বিভিন্ন প্রকারের 'আন্‌-এথিক্যাল মিন্‌স্ অব লাইভ্‌লিহুড'-এর (নীতিবিগর্হিত উপায়ে জীবিকা নির্বাহের) প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কে আরও তীব্রতর করার পিছনে ইন্ধন জোগালেও পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের যথার্থ শক্তি যদি সমাজে তার আদর্শগত প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধারাকে শুধু যে অনেকাংশেই প্রতিহত করা যায় তাই নয়, উপরন্তু জনগণের একটা বিরাট অংশকে বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে নতুন সংগ্রামী মনোভাব এবং উন্নত সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক বলের ওপর মানুষকে দাঁড় করানো সম্ভব। এইভাবেই যুগে যুগে স্তরে স্তরে কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, কাপুরুষতা, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা, হীনমন্যতা প্রভৃতির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে এবং তাদের সংগঠিত করে সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে।

এখন দেখা যাক্ এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করে থাকেন সেইসব তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এ ব্যাপারে তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন কি না। এই প্রশ্নটি বিচার করার আগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। তা হ'ল যে কোন আদর্শ —

তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হোক্, বিপ্লব বা শ্রেণীসংগ্রামের বড় বড় কথাই হোক্ — সব বড় আদর্শেরই প্রাণসত্ত্বা বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলির মধ্যে যে নৈতিক বল এবং নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে তার মধ্যে, এবং তাদের সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। তাই যে কোন রাজনৈতিক মতবাদই হোক্ না কেন তার চর্চার মধ্য দিয়ে নৈতিক বল যদি তৈরি না হয়, উঁচু সংস্কৃতিগত মানকে যদি তা প্রতিফলিত না করে তবে সেই আদর্শবাদের তত্ত্বকথা শুনতে যত বড় বলেই মনে হোক না কেন তা শুধু একটা বাইরের কাঠামো মাত্র এবং তা হ'ল প্রাণহীন দেহের মতো। যেমন প্রাণহীন দেহকে আবর্জনাস্বরূপ জ্ঞান করে ফেলে দিতে হয়, মমতা করে আঁকড়ে ধরে রাখলে তা পূতিগন্ধময় অবস্থায় সমাজে মানুষের অকল্যাণ সাধন করে; তেমনি উঁচুদরের নৈতিকতা এবং উন্নত সংস্কৃতিবর্জিত রাজনৈতিক মতবাদও পরিত্যাজ্য। যদি কোন রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন নৈতিক বলকে জাগাতে না পারে, সাংস্কৃতিক মানকে উঁচু করতে না পারে তবে মনে রাখবেন, সে রাজনীতি অনিষ্টকর এবং তা অকেজো হয়ে গিয়েছে।

তাই যে সব পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলছে বা অন্য কোন আদর্শের কথা বলছে — জটিল তত্ত্ব বিচারের দ্বারা তাদের যথার্থ চরিত্র বিচারের ক্ষমতা যদি নাও থাকে তাহলে এই দিকটি দিয়ে তাদের রাজনীতি প্রকৃতই উন্নত ধরনের ও বিপ্লবী রাজনীতি কি না তা অতি সহজেই চেনা যায়। এই বিচারের মাপকাঠিটি অত্যন্ত সহজ যেখানে ভুল করার কোন সম্ভাবনা নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলেও যদি কোন দল নৈতিক বলকে অধঃপতিত করে, দলের কর্মীরা কুসংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির শিকার বনে যায়, লারে-লাপ্পা কালচারকে প্রতিফলিত করে, কথাবার্তায় ভদ্রতা-শালীনতা না থাকে, আদর্শের সংঘাতকে ভয় পায়, যুক্তি-তর্কের রাস্তা এড়িয়ে গিয়ে গায়ের জোরে অপরকে পদানত করতে চায়, যে কোন যুক্তির আড়ালেই হোক্ না কেন কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়, কর্তব্যকর্মে অবহেলাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে হাজার বার দাবি করলেও সে দলের আদর্শ প্রকৃতপক্ষে উন্নত আদর্শ হতে পারে না, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ তো হতেই পারে না।

সি পি আই (এম) দাবি করে থাকেন যে তাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল। তাঁরা গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে, জনসাধারণ এবং যুবসমাজের মধ্যে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের প্রভাব সব থেকে বাড়ছে। আমি বলি খুব ভাল। তাঁদের প্রভাব বেড়েছে, এ তো সত্য কথা। কিন্তু তাঁরা একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন কি ? তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী দল এবং যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের ধারক-বাহক হিসাবে প্রচার করে থাকেন সেই আদর্শ তো এ যুগের সবচেয়ে বড় এবং মহান বিপ্লবী আদর্শ। ফলে বুঝেই হোক্ বা না বুঝেই হোক্, যুবসমাজ এবং জনগণের মধ্যে তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদজনিত যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় তার ওপর তো একটা 'রেস্ট্রেইনিং এফেক্ট' (কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ) ঘটবে এবং অন্তত তাঁদের প্রভাবিত যুবসমাজ ও জনগণের মধ্যে উন্নত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান প্রতিফলিত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা কি হয়েছে বা হচ্ছে? যদি তাই হত তবে তাঁদের শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে যুব সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের মধ্যে দেশ এবং সমাজের প্রতি 'অব্লিগেশন'-এর (কর্তব্যবোধের) মনোভাব গড়ে উঠত, সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থকে বিপন্ন করে যে কোন মূল্যে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হত। তারা অপরের কোনরকম অন্যায় যেমন সহ্য করত না, তেমনি নিজেরাও জ্ঞানত কোন অন্যায় আচরণ করত না। আদর্শকে অনুসরণ করতে গিয়ে তারা হয়ত বেপরোয়া হত কিন্তু তারা উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব ও কোনরূপ হীনমন্যতার শিকার হত না। যথার্থভাবে যুবসমাজের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নত হত, তাদের দেখে সারা ভারতবর্ষের মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত।

অথচ অতীত দিনের ঘটনাবলী কোন্ সত্যকে প্রমাণ করে? বিগত যুক্তফ্রন্টের সময়ে যখন তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল সি পি আই (এম)-এর শক্তি সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন তাদের কর্মী এবং সমর্থকদের দাপটে দেশের মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। তাদের দলের শক্তিবৃদ্ধি এবং ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে প্রভাববৃদ্ধির ফলে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ওপরে একটা কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ হওয়া তো দূরের কথা, সেই সময়েই দেখা গেল ছাত্রদের মধ্যে গণটোকাটুকি একটি আন্দোলনের(!) রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাদের প্রভাবিত লোকজনদের মধ্যেই বেশি করে পুলিশ এবং প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায় সুযোগসুবিধা নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, সামাজিক কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে 'ডিউটি' (কর্তব্যকর্মে) ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি আদর্শগত সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে

ওঠার পরিবর্তে অনুকূল পরিবেশে কাপুরুষোচিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার হীন প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। আর এই সবেরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই রাজ্যে শাসক কংগ্রেস সরকারি ক্ষমতা দখলের পর যখন তাদের পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল তখন দেখা গেল ফ্রন্টের আমলের সেই 'দুর্দান্ত বিপ্লবী'দের টুঁ-শব্দটি করার পর্যন্ত সাহস নেই। পুনরায় অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আবার হয়তো আপনারা দেখবেন তারা আগের সেই মূর্তিই পরিগ্রহ করেছে যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখা দিতে শুরু করেছে। যদি তাদের রাজনীতি সত্যিই বিপ্লবী রাজনীতি হত তবে একদিকে সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে তারা যেমন পেত আন্তরিক আশীর্বাদ, অন্যদিকে শোষক বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে তারা লাভ করত তীব্র ঘৃণা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঠিক তার উল্‌টোটা। অর্থাৎ একদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের একটি অংশ এবং এমনকী দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীরও একটি অংশ কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসাবে তখন নানাভাবে তাদের সমর্থন করতে শুরু করল, অন্যদিকে সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে দেখা দিল তাদের সম্পর্কে ভীতি। এই সমস্ত ঘটনা যে সত্যকে প্রমাণ করে তা হ'ল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে তারা যে রাজনীতির চর্চা করছে তা আর যাই হোক্ না কেন, কোনমতেই প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়। উপরন্তু তারা এদেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে জনগণের কাছে পরিচিত হওয়ায় তাদের উক্ত আচরণ দেখে ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এবং জনসাধারণের একটি অংশের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কেই গড়ে উঠছে বিভ্রান্তি। তারা যে কেবলমাত্র মার্কসবাদের বুলি আওড়াতে আওড়াতে এবং বিপ্লবের নামাবলী গায়ে দিয়ে অবক্ষয়িত বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির শিকার বনে গিয়ে নিজেদের অধঃপতিত করছে তাই নয়, মার্কসবাদের মতো অমন একটা উচ্চ আদর্শকেও এদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এবং যুবসমাজ ও ছাত্র সমাজের কাছে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট পরবর্তী সময়ে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস যে এত শক্তি অর্জন করল — তারও একটা পরোক্ষ কারণ ফ্রন্টের আমলে সি পি আই (এম)-এর শক্তিবৃদ্ধি। তাদের প্রভাবে পরিচালিত ছাত্রসমাজের মধ্যে যে মানসিকতা, যুবসমাজের মধ্যে যে মানসিকতা যুক্তফ্রন্টের আমলে বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখে ঘরে ঘরে ছাত্র-যুবদের বাবা-মায়েদের থেকে শুরু করে প্রতিটি সাধারণ মানুষ ভেবেছে — 'সর্বনাশ, এই যদি মার্কসবাদীদের চেহারা হয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হলে যদি পাড়ায় পাড়ায়, কলেজে কলেজে যে মূর্তি দেখতে পাই সেই মূর্তি হয় তবে এমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শত হস্তে নমস্কার।' এরই ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরবর্তীকালে দেখা গেল সাময়িকভাবে হলেও প্রতিক্রিয়ার দিকে যাবার ঝোঁক। যুবসমাজ এবং ছাত্রসমাজ পরম বিশ্বাসে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে একদিন ঝুঁকেছিল, সি পি আই এবং সি পি আই(এম)-এর হাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চেহারা দেখে পশ্চিমবাংলার সেই ছাত্র ও যুবসমাজ এবং সাধারণ মানুষ আবার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে আপনাদের মনে রাখতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটা বিপ্লবী তত্ত্ব এবং এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদ, যে আদর্শবাদ ভিয়েতনামের একটি চাষী থেকে শুরু করে একটি শিশুকে পর্যন্ত আমেরিকার নাপাম বোমার বিরুদ্ধে সমস্ত 'পেটি কন্‌সিডারেশন্' (ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ) বিসর্জন দিয়ে লড়াই করার অমিত তেজে খাড়া করে দিয়েছে। এ এমন আদর্শবাদ যে আদর্শবাদকে হাতিয়ার করে চীনের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করল এবং বিপ্লব সফল করল। যে আদর্শবাদের জোরে রাশিয়ার ঘুমিয়ে থাকা চাষী-মজুর বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করল, মিলিটারি দিয়ে যাকে পর্যুদস্ত করা গেল না। সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল যদি সত্যিই সি পি আই (এম) এবং সি পি আই হয়ে থাকে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ যদি সত্যিই তারা প্রচার করে থাকে তাহলে তাদের প্রভাবে তো যুবশক্তি নতুন আদর্শের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় উন্নততর নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানকে প্রতিফলিত করবে। তাহলে একদিকে সমাজে যত তাদের শক্তি এবং প্রভাব বাড়ছে, যুবসমাজের মধ্যে তত উদ্দেশ্যবিহীন বেপরোয়া মনোভাব ও কু-আচার বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান তত অধোগামী হচ্ছে কেন? তারাই আবার 'যুবসমাজ ক্রমাগত উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে' — একথা বলছে কেন? এ ঘটনা কি নিঃসন্দেহে এ সত্যকে প্রমাণ করে না যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে, শ্রেণীসংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের নামে তারা বাস্তবে যে রাজনীতির চর্চা করছে তা আসলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, বা সমাজতন্ত্র নয়?

এরই সাথে যাঁরা সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন তাঁদের যে কথাটি বোঝা

দরকার তা হ'ল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়া মানবতাবাদ তুলনামূলকভাবে তৎকালীন ধর্মভিত্তিক সমাজের আদর্শবোধ ও নীতিনৈতিকতার ধারণার চাইতে আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল জীবনাদর্শ ছিল বলেই সামন্তী সমাজের আবেষ্টনীতে ঘুমিয়ে থাকা কূপমণ্ডুক মানুষগুলোকে খানিকটা জাগিয়ে দিয়ে তাদের একটি অংশের মধ্যে প্রাণচাঞ্চ ল্যের জোয়ার আনতে পেরেছিল, এদেশের যুবসম্প্রদায়কে চরিত্র গঠনের সাধনায় ব্যাপৃত করতে পেরেছিল। অথচ আমাদের দেশের সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কত ত্রুটি ছিল। এ ছিল 'রিলিজিয়ন ওরিয়েন্টেড্ ন্যাশনালিজ্‌ম্' (ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ)। ধর্মীয় কুসংস্কার ও জাতপাতের প্রভাব থেকে এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিল না এবং যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন তাঁরা শেষপর্যন্ত এদেশে পুঁজিবাদকেই সংহত করলেন। তবুও এই নেতৃত্বের অধীনেই যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝান্ডাটা এদেশে তুলে ধরা হ'ল সেই আন্দোলনের হাজার রকমের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তুলনামূলক বিচারে সেই আদর্শ তখন প্রচলিত সমাজ-আদর্শের চেয়ে উন্নততর এবং আপেক্ষিক অর্থে খানিকটা প্রগতিশীল ছিল সেহেতু স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পর্শে গোটা দেশের যুবসমাজের একটি অংশ নতুন তেজে এবং নতুন উদ্দীপনায় কিছুদিনের জন্য সাময়িকভাবে হলেও জেগে উঠেছিল। সমস্ত প্রগতিশীল আদর্শেরই এটা নিয়ম। তাই সেদিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এদেশের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই সীমিতভাবে হলেও অগ্রগতির দ্বার খানিকটা উন্মুক্ত করে দিতে পেরেছিল। রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী যে আন্দোলনের শুরু, সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে সেই ধারার পথ বেয়ে জন্ম নিয়েছিলেন একদিকে আচার্য পি সি রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা; অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ মনীষীরা। এটাই প্রমাণ করে হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও এবং আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দুর্বল ও আপসমুখী হওয়া সত্ত্বেও তদানীন্তন সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই আদর্শ ও নৈতিকতা ভারতবর্ষে তুলনামূলক বিচারে আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে সেই জাতীয়তাবাদী ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শ আজ যে শুধু অকেজো হয়ে গিয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে তাই নয়, উপরন্তু আজ তা ক্ষমতাসীন শাসক-শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে একটা 'প্রিভিলেজ' (সুবিধা) নেওয়ার অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। তাই আজ আর কোনমতেই পুরনো দিনের সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শ যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। আজ তা পচে গিয়েছে এবং পচে গিয়েছে বলেই আজ সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শের জয়ডঙ্কা কংগ্রেস যতই বাজাচ্ছে তত গোটা প্রশাসন এবং গোটা দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। যত তারা বলছে 'সৎ হও' ততই মানুষ হাসতে হাসতে আরও অসৎ হচ্ছে। এমনকী তারা অসৎ হওয়ার মানসিক গ্লানিটুকু পর্যন্ত ভোগ করছে না। অন্যদিকে পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধগুলিও আমাদের সমাজজীবনে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। অথচ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার যথার্থ বিপ্লবী মতবাদ ও বিপ্লবী রাজনীতি আজও আমাদের দেশে জনজীবন ও যুবজীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে না পারার ফলে আদর্শের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তারই পরিণতিতে এই চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং নৈতিকতার সঙ্কট। যুবসমাজকে প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের ভিত্তিতে তাদের উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান গড়ে তুলতে না পারলে কোনমতেই এই অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করা যাবে না। তাই এর জন্য যেমন আপনাদের নিরলসভাবে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, জনগণের মধ্যে নিয়ত কাজ করে যেতে হবে, আবার এই সংগ্রাম পরিচালনার সময় মেকি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সত্যিকারের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতেও আপনাদের শিখতে হবে এবং জনসাধারণকে শেখাতে হবে।

দ্বিতীয়ত যুবসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তীব্র বেকার সমস্যা ও আর্থিক সমস্যা আজ মারাত্মক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। এটাও ঘটছে আমাদের দেশের সঙ্কট জর্জরিত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য। পুঁজিবাদ যেহেতু তার প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়েছে, নিজেই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়েছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক আর শিল্পবিপ্লবের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ করতে পারছে না, বাজার সম্প্রসারণ ঘটাতে পারছে না — দেশের ভিতরেও পারছে না, দেশের বাইরেও পারছে না, সে নিজেই আজ বাজার সঙ্কট সৃষ্টি করছে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে একের

পর এক সঙ্কট ডেকে আনছে। তাই ক্রমাগত তাকে 'ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি' (প্রতিরক্ষা শিল্প) বাড়াতে হচ্ছে। শিক্ষা যে দেশে নেই, সংস্কৃতি যে দেশে নেই, স্বাস্থ্য যে দেশে নেই, যে দেশের সরকার মানুষকে দু'বেলা পেটপুরে খেতে পর্যন্ত দিতে পারে না — সে দেশে কোটি কোটি টাকা 'দেশ বিপন্ন' বলে প্রতিরক্ষা বাজেটে খরচা করতে হয় কেন? না, প্রতিরক্ষা খাতে ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে — খোলাখুলি এই কথা পার্লামেন্টে বলে বসলেন অর্থমন্ত্রী। পার্লামেন্টে একজন কমিউনিস্ট সদস্যও তাকে চেপে ধরল না যে এ কথাটার মানে কী? একটা অনগ্রসর দেশ, অর্ধভুক্ত-অর্ধনগ্ন দেশ, যে দেশের মানুষগুলোকে সে দেশের সরকার খাওয়াতে পরাতে পারে না — সেই রকম একটা দেশের শাসক সম্প্রদায় যখন বলে যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধি আমাদের দেশের অর্থনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন একথার একটিই মানে হয় তা হ'ল পুঁজিবাদের আজ আর বাজার সম্প্রসারণের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তাই বাজারে একটা কৃত্রিম তেজিভাব সৃষ্টির সবসময়ে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এর ফলে বাজারে একটা কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রেখে শিল্পবিকাশ খানিকটা চালু রাখা যায়; আর শিল্পবিকাশ না ঘটলেও অন্তত সঙ্কটজর্জরিত শিল্পগুলিকে খানিকটা রিলিফ দেওয়া যায়। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য করে যে কোটি কোটি টাকা সরকারের হাতে আসে, জনকল্যাণের কাজে তা খরচ না করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুঁজিবাদকে বাজার সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেই বাজারে ক্রেতা হিসাবে উপস্থিত হয়। একটা পিছিয়ে-পড়া অর্থনীতি যদি এইভাবে সমরাস্ত্র তৈরির অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় তাহলে সেই পুঁজিবাদের আর কী প্রগতিশীল ভূমিকা থাকতে পারে? অথচ একদল তথাকথিত মার্কসবাদী বলছেন এটা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব নয়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, মানে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব! আমাদের দেশের ভূমিসম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পুঁজিবাদী সম্পর্ক যে সে জায়গা দখল করেছে তা আমি পুর্বেই দেখিয়েছি। আর এও দেখিয়েছি যে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যা আছে তাও আছে এই কারণে যে বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে ভারতীয় পুঁজিবাদকে আরও শক্তিশালী করার স্বার্থেই আমাদের দেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে সমঝোতা বা কোলাবরেশন-এর নীতি অনুসরণ করে চলেছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তারাও এই কোলাবরেশনকে গোলামি বলছেন না, দাসত্ব বলছেন না। তাহলে তো তাঁরা বলতেন এরা কম্প্রাডর। তাহলে তো তাঁরা বলতেন স্বাধীন রাষ্ট্রটারই কোন অস্তিত্ব নেই, যেমন নকশালপন্থীরা বলছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র একটি স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। বর্তমান বিশেষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের স্বার্থেই যা যা প্রয়োজন শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী তাই-ই করছে এবং সমাজতন্ত্রের ধাপ্পা দিয়ে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে করছে। এইরকম অবস্থায় পুঁজিবাদকে আঘাত না করা এবং পুঁজিবাদবিরোধী রাষ্ট্রবিপ্লবের কার্যক্রম গ্রহণ না করার মানে হচ্ছে মুখে না বললেও কার্যত পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা যদি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকত তাহলে তো কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ যত ঘটবে তত কৃষির আধুনিকীকরণ এবং যন্ত্রীকরণ হবে, শিল্পবিপ্লব তত হবে — তত গ্রাম শহরের বেকাররা কাজ পাবে। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তাই এখানে বেকারিবিরোধী আন্দোলনকে যদি পুঁজিবাদবিরোধী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রবিরোধী, অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা না যায় তবে তা ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হ'ল — পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমাজনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, কাব্য, শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম। এই কথাগুলি যেদিন যুবকরা ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে পারবেন — যেদিন আপনারা বুঝবেন কাজ পাওয়ার জন্য যুবকদের প্রতিদিনের যে আন্দোলন — 'বেকারদের কাজ চাই' বলে আপনারা যে আন্দোলনগুলি গড়ে তুলছেন সেই সমস্ত আন্দোলনগুলি পুঁজিবাদবিরোধী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রবিরোধী বিপ্লব, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে দেশের গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করার বিপ্লবের প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, কেবলমাত্র তখনই আপনারা এই আন্দোলনগুলিকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারবেন। তা না হলে শেষপর্যন্ত এটা হয়ে দাঁড়াবে আশু দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যা হোক্ কিছু বুঝিয়ে যুবকদের সংগঠিত করা এবং তাদের বিপথগামী করে দিয়ে কিছু লড়ালড়ি করানো যেমন তথাকথিত মার্কসবাদী

ও বামপন্থী দলগুলি করে থাকেন। কিন্তু যাকে আমরা বলি 'ইমান্‌সিপেশন' বা শোষণ থেকে মুক্তি, যাকে আমরা বলি সত্যিকারের বেকার সমস্যার সমাধান — সেই সমাধান বা মুক্তির প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যাবে। কারণ সে প্রশ্নটি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

তাই আপনাদের যুব আন্দোলনকে একটা সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত মানুষ পুঁজিবাদবিরোধী যে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলছে, আপনাদের যুব আন্দোলনগুলিকে যদি তার পরিপূরক হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন তবেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রভাব থেকে যুবকদের আপনারা রক্ষা করতে পারবেন এবং বেকার সমস্যারও সমাধান করতে পারবেন।

মনে রাখবেন, মতাদর্শ এবং মূল রাজনৈতিক লাইন ভুল হলে সাংগঠনিক ক্ষমতা ও শক্তি যতই থাকুক তার দ্বারা শুধু অনিষ্টসাধনই হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। মতাদর্শ ও রাজনৈতিক লাইন সঠিক হলে শক্তি আজ যত কমই থাকুক, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চ য় করে একদিন আপনারা বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারবেন। তাই ইন্দিরা কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি এবং জনগণতান্ত্রিক ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শোধনবাদী রাজনীতিকে পরাস্ত করতে সংঘবদ্ধ হোন্, ভয়-ভীতিকে জয় করুন, সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন — ভবিষ্যৎ আপনাদের।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ

১। সি পি আই (এম)-এর কর্মসূচি দ্রষ্টব্য।

২। CPI(M) Central Committee resolution on certain agrarian issues, 8—15 March 1973, Muzaffarpur, P-41.

৩। Tasks on the Peasant Front দ্রষ্টব্য।

৪। 'Once more on the SUCI' — People's Democracy, May 20, 1973.

৫। সি পি আই (এম)-এর প্রোগ্রামের ১০৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। সি পি আই (এম)-এর প্রোগ্রামের রাষ্ট্রকাঠামো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

২৬ জুন ১৯৭৩ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৩ সালের ২ নভেম্বর
প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।